শক্তি: বিভিন্ন উৎস

অমিতাভ রায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান পুস্তিকা

শক্তি ঃ বিভিন্ন উৎস

অমিতাভ রায়
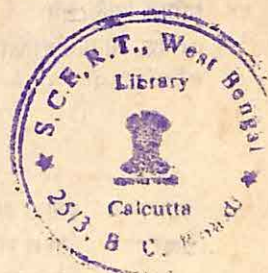
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

SHAKTI : BIBHINNA UTSA
Amitabha Ray

প্রকাশকাল—অক্টোবর, ১৯৮২

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন, নবমতল
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

মুদ্রাকর :
শ্রীতপন ধর চৌধুরী
গ্রাফিক আর্ট প্রেস
৩০-ডি, ডায়মণ্ড হারবার রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৬০

চিত্রাঙ্কন : কুমারী অদিতি গুপ্ত
প্রচ্ছদ : বিমল দাস
চন্দন বসু

Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional languages at the University level, launched by the Government of India, the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

বন্দনা সেন
সুকুমারী দেবী
তপতী রায়
শ্রদ্ধিতেষু

প্রাক্ কথন

সমাজ-সভ্যতার অগ্রগতির কেন্দ্রবিন্দু শক্তি। বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক আলোচ্য বিষয় শক্তি সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই সংক্ষিপ্ত প্রয়াস। বিজ্ঞানের ছাত্র এবং বৈজ্ঞানিক ব্যতীত অন্য সকলের পক্ষে বিজ্ঞান অবোধ্য,—এহেন ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করাও এই প্রচেষ্টার অন্যতম লক্ষ্য। সর্বোপরি বিজ্ঞানকে নির্দিষ্ট ভাষার সীমাবদ্ধতা মুক্ত করার অভিপ্রায়ও বর্তমান উদ্যমের উদ্দেশ্য।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ। পর্ষদ কর্মীদেরও ধন্যবাদ। কারণ, তাঁদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে বইটি প্রকাশিত হতে পারত না। গ্রাফিক আর্ট প্রেসের কর্মীদের এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখি; তাঁরা যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর যুব কল্যাণ অধিকার-এর মাসিক মুখপত্র যুবমানস পত্রিকায় কয়েকটি অধ্যায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত পরিচ্ছেদগুলি প্রকাশের অনুমতি দেওয়ায় তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার বাবা সুন্দরভাবে পাণ্ডুলিপিটি প্রস্তুত করে দিয়েছেন। তাঁকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিজেকে ত্রুটিমুক্ত করছি। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ শঙ্কর কুমার সেন তাঁর চূড়ান্ত কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও, বইটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ-অভিমত দিয়েছেন। তাঁর পরিশ্রমকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু কাজল দাসের পরিকল্পনায় চন্দন বসু প্রচ্ছদটি করে দিয়েছেন; তাঁদের ধন্যবাদ। ভ্রাতুষ্পুত্রী সদৃশ কুমারী অদিতি গুপ্ত ছবি আঁকার জটিল কাজটি করে দিয়ে ধন্যবাদজ্ঞাপনে বাধ্য করেছে। আর সেই প্রবাসী মানুষটিকে স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের আখ্যান শেষ করছি।

অমিতাভ রায় ১লা অক্টোবর, ১৯৮২

কলিকাতা-৭০০ ০৪৫

সূচীপত্র

এক

ভূমিকা

শক্তি সংকট নিয়ে মাতামাতির সীমা পরিসীমা নেই। সুতরাং শক্তির নতুন নতুন উৎস সন্ধানে গবেষণা-পরীক্ষা-নিরীক্ষা-সমীক্ষারও শেষ নেই। শক্তির বিভিন্ন উৎসগুলো যত সংকুচিত হয়ে আসছে ততই বিভিন্ন রাষ্ট্রর মধ্যে শক্তির উৎস নিয়ে বাড়ছে রেষারেষি, দর কষাকষি। কারণ, সবাই জানে শক্তির উপর নির্ভর করছে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব।

শক্তির সন্ধানে মানুষকে সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে ঘুরে বেড়াতে হলেও শক্তি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা জন্মাতে অনেক কাল কেটে গেছে। শক্তির প্রয়োজনীয়তা, শক্তির প্রভাব, শক্তির প্রয়োগ ইত্যপ্রকার ব্যাপার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হলেও আদতে শক্তি বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট ধারণা মানুষ খুব বেশীদিন আগেও রপ্ত করতে পারেনি ; নিদেন পক্ষে স্যার আইজাক নিউটনের আগে মানুষ শক্তির তত্ত্বগত দিক সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। অবিশ্যি এটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতিতে বিভিন্ন ঘটনাই দীর্ঘদিন ধরে ঘটছে। মানব সভ্যতার উন্নয়নের সাথে সাথে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা-সমীক্ষা-গবেষণার দ্বারা এসব ঘটনার কারণ বিশ্লেষিত হয়। উদাহরণ হিসাবে পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমার কথা বলা যায়। সৃষ্টির আদিযুগ থেকেই পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। কিন্তু সপ্তদশ শতকে গ্যালিলিও কর্তৃক এ ঘটনার তাৎপর্য নির্ণয় করার আগে পর্যন্ত মানব সভ্যতার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্য ধারণা ছিল। কাজ করার ক্ষমতাই হল শক্তি—শক্তির এই সংজ্ঞাটি তাপগতিবিদ্যার (thermodynamics) অধীত বিষয় ; এবং এই সংজ্ঞাটি আজ প্রতিষ্ঠিত। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অ্যালবার্ট আইনস্টাইন শক্তি ও বস্তুর সম্পর্ক নির্ণয় করলেন ; জড়ের ভরকে আলোর গতির বর্গ দিয়ে গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যায় তা তুল্যমূল্য শক্তির সমান হবে, আইনস্টাইনের এই সূত্র প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী m যদি জড়ের ভর হয় এবং c যদি আলোর গতিবেগ হয় তাহলে শক্তি $E=mc^2$ হয়। তাহলে জড়ই তো

শক্তি! তা হলে শক্তির ঘাটতি নিয়ে এত চিন্তা কেন? বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে খুব পরিষ্কারভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অভাব আসলে শক্তির নয়। অভাব শক্তি উৎসর, বললেও প্রসঙ্গটির সঠিক ব্যাখ্যা করা হয়না। কারণ জড়ই যখন শক্তি তখন শক্তি উৎসরও ঘাটতি হবার কথা নয়। মূল সমস্যা হল—জড় পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার কৌশল সম্পর্কিত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। যান্ত্রিক শক্তি, তাপ শক্তি, আলোক শক্তি, চৌম্বক শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি, রাসায়নিক শক্তি এবং পারমাণবিক শক্তি। এই সাত প্রকার শক্তি আপাততঃ মানুষের করায়ত্ত। তার মানে এই নয় যে, যে কোন জড় পদার্থকে ব্যবহার করে এই সাতপ্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। কয়েকটি নির্দিষ্ট জড়পদার্থকে কোন নির্দিষ্ট শক্তিতে রূপান্তরিত করার কায়দাকানুন মানুষ জানে। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে এইসব নির্দিষ্ট জড় পদার্থগুলির সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে আসছে। তাই এত হৈ চৈ।

শক্তির বিনাশ নেই। শক্তি সৃষ্টি করা যায় না। কেবলমাত্র শক্তির রূপান্তর ঘটান যায়। রূপান্তরের সময় কিছু শক্তি উদ্দিষ্ট রূপান্তরিত শক্তি না হয়ে অন্যভাবে নির্গত হয়। অর্থাৎ রূপান্তরের আগে যে পরিমাণ শক্তি থাকে রূপান্তরিত শক্তির পরিমাণ তার সমান হওয়ার কথা। কিন্তু রূপান্তরের সময় নানাভাবে কিছু শক্তি ব্যয় হয়। ফলে সাধারণ ক্ষেত্রে রূপান্তরিত শক্তির পরিমাণ কিছুটা কম হয়।

এখনও পর্যন্ত যত রকম শক্তির ব্যবহার করতে মানুষ সক্ষম হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী কার্যক্ষম হল বৈদ্যুতিক শক্তি; অন্য শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার বেশ কিছু কৌশল এখনও পর্যন্ত মানুষ আয়ত্ত্বে আনতে পেরেছে। বিদ্যুৎ সরাসরি প্রকৃতি থেকে আহরণ করা যায় না। অথচ আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক সভ্যতা সম্পূর্ণতঃ বিদ্যুৎ নির্ভর বললে অত্যুক্তি করা হয় না। বর্তমান পৃথিবীর উৎপাদন ব্যবস্থার প্রায় সবটুকুই বিদ্যুতের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় শিল্প সংস্থার উৎপাদন থেকে শুরু করে রান্নাঘরের কোন পর্যন্ত সর্বত্র বিদ্যুৎ-এর অবাধ গতিবিধি। কৃষি, যোগাযোগ, পরিবহণ, চিকিৎসা, শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি মানবজীবনের প্রতিটি অংশে আজ বিদ্যুৎ চাই। বিদ্যুৎ এবং মানব জীবনের সমন্বয় আজ যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে ভাবতেও অবাক লাগে মাত্র একশ বছর আগেও মানব সভ্যতার সাথে বিদ্যুতের তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী লণ্ডনে প্রথম বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু

হয় আর ঐ বছর ৪ঠা সেপ্টেম্বর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ শুরু হয় আমেরিকার নিউইয়র্কে। মাত্র একশ বছরে বিদ্যুৎ-এর ব্যবহার কত বেড়েছে। সুতরাং সঙ্গত কারণেই বৈদ্যুতিক শক্তির বিকাশ এবং আহরণের ব্যাপারে মানব সভ্যতা অনেক বেশী সক্রিয়। যে সমস্ত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ আহরণ করা হয় সে সম্পর্কে জানার আগ্রহও বেশী। পরের অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন শক্তি উৎসর সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। তবে ব্যবহার ও প্রয়োজনের ব্যপকতা বিচার করে সঙ্গত কারণেই জোর দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর ; অর্থাৎ যে সব জড়কে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি মানুষের করায়ত্ত সেই সব জড় পদার্থ বা শক্তি উৎস সম্পর্কেই আলোচনা মূলতঃ সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

দুই

কয়লা

কয়লা। শক্তি উৎসগুলির মধ্যে কয়লা সবচেয়ে বেশী পরিচিত। কয়লা এমন একটি জৈব জড় পদার্থ যা থেকে সরাসরি তাপশক্তি পাওয়া যায়। জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার ছাড়াও কয়লা থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় পদার্থ পাওয়া যায়।

আজ আমরা পৃথিবীকে যেমন দেখছি, পৃথিবীর চেহারা চিরকালই এরকম ছিল না। নানা রকম প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে পৃথিবী আজকের এই অবস্থায় এসেছে। পৃথিবীতে এক সময় বহু গাছ ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং সাধারণভাবে ঝড়ে পড়া গাছের পাতা এবং কাণ্ড এক সময় আস্তে আস্তে ভূপৃষ্ঠের নীচে চলে যায় এবং জমতে থাকে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে সেলুলোজ, লিগনিন, মোম এবং রজন এই চারটি রাসায়নিক পদার্থ হল গাছ বা উদ্ভিদ দেহের প্রধান উপাদান। উদ্ভিদের দেহাবশেষ থেকে সেলুলোজ পদার্থটি সবার আগে জল ও কার্বনডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে লিগনিন মোম ও রজন জাতীয় উপাদানগুলিও হিউমিক এ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। পলিমারাই-জেশন ও অক্সিডেশন প্রক্রিয়ার ফলে হিউমিক এ্যাসিড থেকে হিউমাস নামক একটি পদার্থ সৃষ্টি হয়। হিউমাস হল কাদার মত থকথকে একটি পদার্থ। হিউমাস থেকে জলীয় পদার্থ অন্তর্হিত হলে অর্থাৎ হিউমাস শুকিয়ে গেলে পিট্ নামক একটি পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই পিট্‌কে বলা যায় কয়লার প্রাথমিক অবস্থা। বহুযুগ আগে পৃথিবীর উপরকার উদ্ভিদের দেহাবশেষ থেকে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় পিট্ উৎপন্ন হয়। পরবর্তী সময়ে এই পিট্-এর উপর জমা পলির স্তরের চাপ, পৃথিবীর ভিতরের প্রচণ্ড উত্তাপ, বায়ুর অভাব এবং বদ্ধ জলের উপস্থিতিতে পিট্ জাতীয় পদার্থের অঙ্গারীভবন (carbonisation) শুরু হয়। অঙ্গারীভবনের প্রাথমিক অবস্থায় তৈরী হয় বিটুমেন। উদ্ভিদ-দেহের প্রোটিন জাতীয় উপাদানের সঙ্গে মোম ও রজন জাতীয় উপাদানগুলির একত্রীভবনের ফলেই বিটুমেন তৈরী

হয়। অঙ্গারীভবন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে সৃষ্টি হয় কয়লা। কয়লার জন্ম বৃত্তান্ত থেকে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে কয়লা মাটির নীচে থাকে। প্রথম কবে মাটি খুঁড়ে মানুষ কয়লা আবিষ্কার করেছিল তা জানা যায় না। তবে প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং চীনে কয়লার ব্যবহার হত বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। থিওফ্রাস্ট (Theofrast)-এর রচনা থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে গ্রীস দেশে কয়লার প্রচলন ছিল। যতদূর জানা যায় মাটি খুঁড়ে কয়লা আহরণের কঠিন কাজটি প্রাচীন যুগে সম্পাদিত হত না। মাটি ধ্বসে গিয়ে অথবা ক্ষয় হয়ে কয়লার স্তর অনাবৃত হয়ে পড়লে সেই কয়লা কেটে নিয়ে ব্যবহার করা হত। সুতরাং বলাই বাহুল্য সে যুগে কয়লার ব্যাপক ব্যবহার ছিল না। অঞ্চল ভিত্তিক সামান্য ব্যবহার ছিল। ১১১৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর আশেন (Aachen) শহরের অগাষ্টিন চার্চের পাদ্রীরা প্রথম কয়লার খনি চালু করেন। অর্থাৎ এই প্রথম সংগঠিত উপায়ে কয়লার খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের কাজ শুরু হল। এর কিছুদিনের মধ্যেই ইংল্যাণ্ডেও কয়লা খনির কাজ শুরু হয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও দ্বাদশ শতাব্দীতে কয়লা খনির কাজ শুরু হয়। তবে শিল্পবিপ্লবের আগে পর্যন্ত কয়লার ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। শিল্পবিপ্লবের আগে জ্বালানী ছাড়া অন্যান্য কাজে কয়লা ব্যবহারের সুযোগ ছিল না। তবে ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে ডড্‌লেই নামক জনৈক ইংরেজ আকরিক থেকে লোহা নিষ্কাশনের জন্য কয়লা ব্যবহার করেন। এর আগে পর্যন্ত আকরিক থেকে লোহা নিষ্কাশনের কাজে কাঠ-কয়লা ব্যবহৃত হত। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল সাধারণ কয়লা ব্যবহার করে নিষ্কাশিত লোহার মান কাঠ কয়লার সহায়তায় নিষ্কাশিত লোহার চেয়ে নিকৃষ্ট। সুতরাং গবেষণা চলতে লাগল। অবশেষে ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ডার্বি (Derby) কর্তৃক কোক কয়লা দিয়ে লোহা গলাবার পদ্ধতি উদ্ভাবনের পর দেখা গেল আকরিক থেকে লোহা নিষ্কাশনের জন্য কোক কয়লা ব্যবহার করা ভাল। কারণ, এভাবে নিষ্কাশিত লোহা অনেক উৎকৃষ্ট। তারপরে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে জেমস্ ওয়াট (James Watt) কর্তৃক বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হওয়ার পর কয়লার ব্যবহার অনেক বেড়ে যায়। ওয়াট তাঁর ব্লোয়িং ইঞ্জিনের (Blowing Engine) জন্য কোক্ ব্যবহার করেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কয়লা থেকে প্রাপ্ত কোল গ্যাসের সাহায্যে বাতি জ্বালান হয়। ডুয়োডোনাল্ড (Duodonald) এই পদ্ধতির স্রষ্টা। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের বার্মিংহাম শহরের কাছে সোহো (Soho) নামক একটি জায়গায় প্রথম কোল গ্যাস তৈরীর

কারখানা স্থাপিত হয়। কোলগ্যাসের আলোয় রাস্তা আলোকিত করার কাজ শুরু হয় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। সাইমন কার্ভস জাতীয় কোকচুল্লী জার্মানীর গেলসেনকির্শেন-(Gelsenkerchen) নামক স্থানে হুসেনার (Hussener) কর্তৃক ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ১৮৮২তে কোক ওভেন ব্যাটারী প্রবর্তিত হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্র্যাঙ্ক কর্তৃক কোলগ্যাস থেকে বেঞ্জল আবিষ্কৃত হয় !

কয়লা থেকে কোল গ্যাস, আলকাতরা, বেঞ্জল, অ্যামোনিয়া, টলুয়িন প্রভৃতি বহুবিধ পদার্থ পাওয়া গেলেও কয়লার মূল প্রয়োজন জ্বালানী ক্ষেত্রে। রান্না অথবা বাষ্পীয় ইঞ্জিনের জ্বালানীর কাজে কয়লা ব্যবহার পুরনো হলেও আধুনিক যুগে কয়লা ব্যবহারের প্রধান ক্ষেত্রে হল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান উপাদান কয়লা। পরে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলা যাবে। আপাততঃ কয়লার শ্রেণী বিভাগটুকু জানা যাক। বিজ্ঞানী রেনো (Regnault) কয়লাকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। ১। অ্যানৃথ্রাসাইট (Anthracite); ২। লিন বা ছোট শিখার বিটুমিনাস (Lean or Short Flame Bituminous); ৩। বিটুমিনাস্ স্মিথি (Bituminous Smithy); ৪। দীর্ঘশিখার বিটুমিনাস (Long Flame Bituminous); ৫। শুষ্ক দীর্ঘ শিখা (Dry Long Flame)। পরবর্তীকালে অধ্যাপক বোন (Bone) কয়লাকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন ঃ

১। লিগনাইট ঃ এই জাতীয় কয়লা কোক তৈরীর অনুপযোগী। রির্ভাবাটারি ফার্নেসে এই কয়লা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

২। বিটুমিনাস ঃ এই কয়লা জ্বালালে দীর্ঘশিখা হয়। এই কয়লা কোক তৈরীর জন্য আদর্শ। এই ধরনের কয়লা থেকে কোলগ্যাসও পাওয়া যায়। বয়লারে (বাষ্পীয় ইঞ্জিনে বা বাষ্পের প্রয়োজন আছে এমন যন্ত্রে জলকে বাষ্পে পরিণত করা হয় যে যন্ত্রের সাহায্যে অর্থাৎ যে যন্ত্রে জল ফুটিয়ে বাষ্প করা হয়।) এই ধরনের কয়লা ব্যবহৃত হয়।

৩। সেমিটিমিনাস্ ঃ ছোট শিখা সৃষ্টিকারী এই ধরণের কয়লায় কোক তৈরী হয় না তবে বয়লারে কাজে লাগে।

৪। অ্যানথ্রাসাইট্ ঃ এই কয়লা থেকেও কোক তৈরী হয় না তবে সাধারণ জ্বালানী হিসাবে এই জাতীয় কয়লা বহুল ব্যবহৃত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর ষ্ট্যাণ্ডাডাইজেশন এ্যাসোসিয়েশন (A.S.T.M.S.) কিন্তু

কয়লাকে প্রধান চারভাগে ভাগ করেছে। এগুলি হল— ১। অ্যানথ্রাসাইট, ২। বিটুমিনাস, ৩। সাব বিটুমিনাস ও ৪। লিগনাইট। অ্যানথ্রাসাইটকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (ক) মেটা অ্যানথ্রাসাইট, (খ) নর্মাল অ্যানথ্রাসাইট, (গ) সেমি অ্যানথ্রাসাইট।

বিটুমিনাসকে পাঁচভাগে ভাগ করে নাম দেওয়া হয়েছে—(ক) লো ভোলাটাইল, (খ) মিডিয়াম ভোলাটাইল, (গ) হাই ভোলাটাইল—এ, (ঘ) হাই ভোলাটাইল—বি এবং (ঙ) হাই ভোলাটাইল সি।

লিগনাইটকে দু ভাগে যথাক্রমে ব্রাউন কোল ও লিগনাইট-এ ভাগ করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি সংস্থা কোল গ্রেডিং বোর্ড কয়লাকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। এগুলি হল— ১। সিলেক্টেড ২। ফার্স্ট ৩। সেকেণ্ড ৪। থার্ড। প্রতিটি ভাগকে আবার কম ও বেশী উদ্বায়ী হিসাবে দুটি শ্রেণীতে (লো ভোলাটাইল ও হাই ভোলাটাইল) ভাগ করা হয়েছে।

আধুনিক যুগে কয়লার প্রধান প্রয়োজনীয়তা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে,—একথা আগেই বলেছি। আর বিদ্যুতের চাহিদা যেভাবে বাড়ছে তাতে কয়লার সঞ্চয় দিন দিন অতি দ্রুত হারে ফুরোচ্ছে। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পল এভারিট পৃথিবীতে ব্যবহার-যোগ্য, অব্যবহারযোগ্য উত্তোলন যোগ্য, অনুত্তোলন যোগ্য সমস্ত প্রকার কয়লার মজুতের যে হিসাব দিয়েছেন সেই অনুযায়ী মোট ১৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৪০০ কোটি টন কয়লা সারা পৃথিবীতে আছে। এই হিসাব সর্বজন স্বীকৃত। তবে এই কয়লার কতটুকু ব্যবহার করা যাবে সেই নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহল দ্বিধাগ্রস্ত। তবে সর্বনিম্ন যে পরিমাণ সম্পর্কে সবাই একমত তা হল—পৃথিবীতে মোট ৭ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টন ব্যবহারযোগ্য কয়লা আছে। আর ভারতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ হল—১১ হাজার ৫০০ কোটি টন নন্ কোকিং কয়লা (যে কয়লা কোক হিসাবে ব্যবহৃত হয় না) এবং ১৮০ কোটি টন কোকিং কোল।

মাটির নীচে ৩০ সেন্টিমিটার থেকে ১৮০০ মিটার গভীরতায় কয়লা থাকে। অত-এব কয়লা সংগ্রহ করতে গেলে খনন প্রক্রিয়া অপরিহার্য। কয়লা সংগ্রহর জন্য সাধা-রণতঃ দুভাবে মাটি খনন করা হয়। যে জায়গায় মাটির নীচে কয়লা থাকে সেখানে একটা পুকুরের মত করে মাটি কেটে তারপর কয়লা কাটা শুরু হয়। অর্থাৎ কয়লা কাটতে কাটতে ভূগর্ভে প্রবেশ করা হয়। এই ধরণের খনন কার্য সাধারণতঃ যেখানে কয়লা মাটির সামান্য নীচে থাকে সেখানেই করা হয়। পুকুর কাটার সময় যেমন ঝুড়ি

করে মাটি পাড়ে ফেলা হয় এখানেও তেমনি কয়লা কেটে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উপরে পাঠান হয়। এই ধরণের খনিতে নিরাপত্তা বেশী থাকে।

দ্বিতীয় ধরনের কয়লার খনিতে মাটির নীচে সুড়ঙ্গ করে কয়লা কাটতে কাটতে এগোন হয় এবং গভীরে প্রবেশ করা হয়। উপরের মাটির স্তরকে ধরে রাখার জন্য মধ্যে মধ্যে কয়লারই স্তম্ভ রেখে যেতে হয়। এই ধরনের কয়লা খনিতে নিরাপত্তার দরকার বেশী। প্রথমতঃ একটা বদ্ধ জায়গায় কর্মীদের কাজ করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ কয়লা কাটতে কাটতে এগোনর সময় অনেক সময় কয়লার স্তরে ধ্বস নামে। তৃতীয়তঃ অনেক সময় ভূগর্ভের কয়লার স্তরের নীচে থাকা জল, খনির মধ্যে প্রবেশ করে বিপদ ঘটায়। এছাড়া যান্ত্রিক ত্রুটির ফলেও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা এই ধরণের খনিতে বেশী। উদ্ভিদের পরিবর্তিত আকৃতি ও প্রকৃতি হল কয়লা। কয়লা সংগ্রহ যতই শক্ত হোক কয়লা মানব সভ্যতার এক প্রধান ভিত্তি। শুধু মাত্র শক্তি উৎস ছাড়াও কয়লার বাপক ব্যবহার কয়লার প্রয়োজন অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে এবং কয়লার ব্যবহার যেভাবে বাড়ছে তাতে পৃথিবী কয়লা শূন্য হতে খুব বেশী সময় লাগবে না।

প্রসঙ্গতঃ জেনে রাখা ভাল, ১ মেট্রিকটন অ্যানথ্রাসাইট বা বিটুমিনাস জাতীয় কয়লা থেকে ৭০ লক্ষ ৪০ হাজার কিলো-ক্যালরি তাপ শক্তি পাওয়া যায়। আর লিগনাইট জাতীয় কয়লার ক্ষেত্রে প্রতি টনে ৩৫ লক্ষ ১০ হাজার থেকে ৪৭ লক্ষ কিলো ক্যালরি তাপ পাওয়া যায়।

তিন

পেট্রোলিয়াম

আজকের সমাজ-সভ্যতায় খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়ামের ভূমিকার সপক্ষে যুক্তি-তর্ক বিস্তারের অবকাশ নেই। বটতলার আটচালা থেকে শুরু করে আধুনিকতম পরিবহন ব্যবস্থা সর্বত্রই এর সমান গতিবিধি। মোটর গাড়ি যাবার পাকা রাস্তার পিচ আর মোটর গাড়ি চলার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী পেট্রোল দুই-ই নিষ্কাশিত হয় পেট্রোলিয়াম থেকে। গাঁ-ঘরে রাতের সাথী কেরোসিন আর চাষের রাসায়নিক সার সবই পাওয়া যায় পেট্রোলিয়াম থেকে। পরিধানের টেরিলিন, পলিয়েস্টার, ক্যাশমিলন আর প্রসাধনের সামগ্রীর আকর বস্তু কিন্তু সেই-ই পেট্রোলিয়াম। পেট্রোলিয়ামের এহেন বহুবিধ ব্যবহার সত্ত্বেও, এর মূল উপযোগিতা কিন্তু জ্বালানী বা শক্তি উৎস হিসাবে। পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রীর ব্যবহারের প্রধান ক্ষেত্র হল বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিকশক্তি আহরণ।

ল্যাটিন শব্দ পেট্রোলিয়ামকে বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় পেট্রা ও অলিয়াম। পেট্রা অর্থাৎ পাথর আর অলিয়ামের বাংলা অর্থ তেল। দুয়ে মিলে দাঁড়ায়, পাথরের তেল অর্থাৎ পাথরের মধ্যে সঞ্চিত তেল। পেট্রোলিয়ামের জন্মবৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, এর নামকরণ কত সার্থক।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীর স্থলভাগের অনেকাংশেই গরম সমুদ্র জলের নীচে ছিল,—এ ধারণা আজ সর্বজন স্বীকৃত। সে সময় বড় বড় গাছগাছড়ার অভাব ছিল না। প্রচুর সামুদ্রিক প্রাণীও সাগরে বিচরণ করত। টার্শিয়ারি যুগে অর্থাৎ আজ থেকে পাঁচ-ছয় কোটি বছর আগে সমুদ্রের তলদেশে সৃষ্টি হল পাললিক শিলা। মাটি ও বালি জমেই স্তরে স্তরে সৃষ্টি হয় পাললিক শিলা। একটা স্তরের উপর আরেকটা স্তর তৈরি হবার আগে তার উপর যেসব প্রাণীজ ও উদ্ভিজ দেহাবশেষ এসে পড়ত খুব স্বাভাবিকভাবেই তা পরবর্তী স্তরের আবরণে আবৃত হত। এই-ভাবে বিভিন্ন সময়ে পাললিক শিলা তৈরির সময় পাললিক শিলার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে প্রাণীজ ও উদ্ভিজ দেহাবশেষ সঞ্চিত থেকে যায়। তারপর প্রকৃতিতে আবার

শুরু হয় ভাঙ্গাগড়ার খেলা, বহু স্থলভূমি চলে যায় সাগরের তলায়। সমুদ্র তলদেশ থেকে উদ্ভূত হয় নতুন স্থলভাগ। এদিকে পাললিক শিলার মধ্যবর্তী স্তরগুলিতে আটকে পড়া প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ দেহাবশেষে বিক্রিয়া বন্ধ হল না। প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ দেহাবশেষের বিবর্তন ঘটতে থাকে। জৈব পদার্থগুলির বিবর্তনে সৃষ্টি হল হাইড্রোজেন ও কার্বন ঘটিত যৌগিক পদার্থ,—হাইড্রোকার্বন। পরবর্তীকালে এই হাইড্রোকার্বন পরিণত হয় পেট্রোলিয়ামে। প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ দেহাবশেষের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন অপসারণের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে ব্যাক-টেরিয়া। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মুক্ত দেহাবশেষ ক্রমাগত চাপ ও তাপের প্রভাবে পেট্রোলিয়ামে পরিণত হয়েছে। ভূগর্ভস্থ তাপ ও উপরের পাললিক শিলা এবং ক্ষেত্রবিশেষে সমুদ্রের জল প্রয়োজনীয় চাপ যোগান দিয়েছে। পেট্রোলিয়াম-এর উৎপত্তি সংক্রান্ত ধারণা নিয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য থাকলেও অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই এই ধারণাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ভূগর্ভে দুটি অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের মধ্যবর্তী সচ্ছিদ্র শিলাস্তর হল পেট্রোলিয়াম-এর প্রকৃতিতে অবস্থানের আদর্শ জায়গা। সচ্ছিদ্র শিলাস্তরে পেট্রোলিয়াম সঞ্চিত থাকে আর তার নীচে অপ্রবেশ্য শিলাস্তর থাকার জন্য পেট্রোলিয়াম সুরক্ষিত থাকে। অপ্রবেশ্য শিলাস্তর বা সচ্ছিদ্র শিলাস্তর শব্দ-গুলি নতুন শোনালেও এদের প্রাথমিক ধর্মগুলি কিন্তু শব্দগুলির মধ্যে পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট। আর এ ধারণা তো আমাদের সবার আছে, তরল পদার্থ শক্ত আবরণে আবদ্ধ না থাকলে তরলের সংরক্ষণ সম্ভব নয়। অপ্রবেশ্য শিলাস্তর দিয়ে ঢাকা থাকার ফলে পেট্রোলিয়াম সচ্ছিদ্র শিলাস্তরে মজুত থাকে। অন্যথায় পেট্রোলিয়াম ভূগর্ভে কোথায় গিয়ে পৌঁছাত তা চিন্তা করাও কষ্টকর।

ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক গঠনপ্রণালীর ফলে কিছু কিছু জায়গা সৃষ্টি হয় যে সব জায়গায় পেট্রোলিয়াম জমা হলে আর বেরোতে পারে না। প্রাকৃতিক বৈচিত্রের ফলে ভূ-স্তর বিন্যাসের ফলশ্রুতি,—এধরণের জায়গায় পেট্রোলিয়াম একবার সঞ্চিত হলে সেখানেই সুরক্ষিত থাকে। এগুলিকে পরিভাষায় বলে 'তেলের খাঁচা' বা অয়েল ট্র্যাপ। যে নির্দিষ্ট শিলাস্তরে পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হয় সেই শিলাস্তর থেকে কৈশিক চাপ (Capillary pressure), পেট্রোলিয়ামের প্লবতা (buoy-aucy), মাধ্যাকর্ষণ ইত্যপ্রকার কারণে অনেক সময় পেট্রোলিয়ামের স্থান পরিবর্তন ঘটে। অয়েল ট্র্যাপে এইভাবেই পেট্রোলিয়াম এসে পৌঁছায়। তবে অনেকক্ষেত্রে আবার উৎপত্তিস্থলই অয়েল ট্র্যাপ হিসাবে কাজ করে। উৎপত্তিগত কারণেই

পেট্রোলিয়াম শুধুমাত্র স্থলভাগের নীচে পৃথিবীর অভ্যন্তরেই নয় সমুদ্রের তলদেশের ভূ-গর্ভেও সঞ্চিত থাকে।

পেট্রোলিয়াম আহরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জটিল কাজ পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান। প্রযুক্তিবিজ্ঞানের উন্নয়নের ফলে ভূগর্ভে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানের কাজটি সহজ হয়েছে ঠিকই কিন্তু এখনও এমন কোন প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়নি যার সাহায্যে কোন নির্দ্দিষ্ট জায়গার ভূগর্ভস্থ পেট্রোলিয়ামের অবস্থান ও তার পরিমাণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানের প্রচলিত পদ্ধতি হল,—

প্রথমে সমুদ্রজাত পাললিক শিলা অন্বেষণ। উৎপত্তিগত কারণেই পেট্রোলিয়াম সমুদ্রজাত পাললিক শিলাস্তরের অভ্যন্তরে অবস্থিত অয়েল ট্র্যাপে থাকে। সমুদ্রজাত পাললিক শিলার খোঁজ পাওয়ার পর ঐ এলাকার এক বিস্তারিত মানচিত্র তৈরী করা হয়। এবার ঐ মানচিত্র ধরে ঐ এলাকার মাটি, শিলাস্তর প্রভৃতির গঠন বৈচিত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা-সমীক্ষা চলে। ঐ অঞ্চলের শিলার গঠন বিন্যাস অনুধাবন করতে হয়। আকাশ থেকে তোলা ফোটো বা এরিয়েল ফোটোগ্রাফ পদ্ধতিতে শিলার গঠন বিন্যাস সম্পর্কে সহজে ধারণা করা যায়। পাশাপাশি চলে ঐ এলাকার ভূগর্ভর গঠন বিন্যাস নিয়ে তথ্য সংগ্রহ।

গ্র্যাভিমিটার, ম্যাগনেটোমিটার আর সিস্‌মোগ্রাফ এই তিনটি যন্ত্র হল ভূগর্ভর গঠন বিন্যাস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রধান উপকরণ। গ্র্যাভিমিটার দিয়ে মাধ্যাকর্ষণ পরিমাপ করা হয়, ম্যাগনেটোমিটার ব্যবহৃত হয় চৌম্বকশক্তি নির্ণয়ের জন্য আর সিস্‌মোগ্রাফ হল ভূকম্পন পরিমাপক যন্ত্র। পাললিক শিলা, আগ্নেয় শিলা বা রূপান্তরিত শিলার চেয়ে অনেক হাল্কা। অতএব পাললিক শিলার মাধ্যাকর্ষণ ও চৌম্বক শক্তি অনেক কম। ভূগর্ভে ডিনামাইট বিস্ফোরিত হলে ভূগর্ভে কম্পন সৃষ্টি হয়। ভূকম্পনের ফলে সৃষ্ট কম্পনতরঙ্গ পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু যে মুহূর্তে ওই কম্পনতরঙ্গ প্রতিহত হয় তক্ষুনি তা ফিরে আসে। প্রতিহত কম্পন তরঙ্গর তীব্রতা সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে ধরা পড়ে। বিষয়টি অত্যন্ত সহজ। ভূগর্ভে কঠিন স্তর থাকলে কম্পন তরঙ্গ দ্রুত ফিরে আসবে এবং তার তীব্রতা বেশী হবে। কিন্তু ভূগর্ভে পাললিক শিলা থাকলে কম্পন তরঙ্গ প্রতিহত হবার বদলে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ বেশী পায়। এইভাবে বিভিন্ন উপায়ে বারংবার পরীক্ষা করে কোন জায়গার ভূগর্ভস্থ পাললিক শিলাস্তর সম্বন্ধে একটা অনুমান করা যায় মাত্র। এরপর তেল উত্তোলন, তারপর নিষ্কাশন।

ভূগর্ভস্থ জল সংগ্রহর জন্য কূপ বা কুয়ো খুঁড়তে হয়। এ তথ্য মানুষ অনেক দিন আগে থেকেই জানে। পরবর্তীতে এ ধরণের কুয়োর উন্নয়ন ঘটেছে। কম পরিশ্রম করে বেশী জল সংগ্রহর বিভিন্ন ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। চালু হয়েছে নলকূপ বা টিউবওয়েল। পেট্রোলিয়াম ঘন তরল পদার্থ। পেট্রোলিয়ামও ভূগর্ভেই থাকে। অতএব পেট্রোলিয়াম উত্তোলনের জন্য কূপ খনন একান্ত প্রয়োজনীয়।

সাধানণতঃ মাটির নীচে ৩ হাজার থেকে ৬৫০০ মিটার অর্থাৎ তিন থেকে সাড়ে ছয় কিলোমিটার নীচে অয়েল ট্র্যাপ বা পেটে্রালিয়ামের প্রাকৃতিক সংরক্ষণাগার থাকে। এত সুগভীর কূপ খননের জন্য দরকার ড্রিলিং রিগ। এই যন্ত্রটি মাটি খুঁড়বার কাজে ব্যবহৃত হয়। শুধুমাত্র মাটিই নয়, পাথর কাটতেও এই যন্ত্রটি সক্ষম। ৩ কিলোমিটার গভীর কূপ খননের জন্য ২০০ টনের ড্রিলিং রিগ লাগে ; ১৫ হাজার থেকে ১৭ হাজার ফুট ড্রিল পাইপ এই গভীরতার কূপ খননে প্রয়োজন। এই জাতীয় কূপ খননে আরও লাগে ১৪ হাজার থেকে ১৬ হাজার ফুট কেসিং পাইপ ; ৬০ থেকে ১০০টি ড্রিলিং বিট, ৫০০ থেকে ১ হাজার টন ড্রিলিং মাড (বিশেষ ধরণের রাসায়নিক যৌগ), ২ হাজার থেকে ৫ হাজার বস্তা সিমেণ্ট ৪৮ হাজার ব্যারেল জল এবং ৩ হাজার ব্যারেল জ্বালানী তেল। যেখানে পেটে্রালিয়াম উত্তোলনের জন্য কূপ খনন করা হবে বলে ঠিক করা হয় সেখানে একটি সুউচ্চ ইস্পাতের স্তম্ভ বসান হয়। এই স্তম্ভর নাম ডেরিক। ডেরিক থেকে ড্রিলিং পাইপ ঝুলিয়ে দিয়ে তাকে আস্তে আস্তে হাতে কাটা একটি অগভীর গর্তে প্রবেশ করান হয়। ড্রিলিং পাইপের সামনে বসান থাকে ড্রিলিং বিট। এইবার মোটরের সাহায্যে ড্রিলিং বিট সহ ড্রিলিং পাইপ মাটির নীচে ঘুরতে ঘুরতে মাটি কাটতে কাটতে নীচে প্রবেশ করে। একটি ড্রিলিং পাইপ সম্পূর্ণভাবে ভূগর্ভে প্রবেশ করলে আর একটি পাইপ জুড়ে দেওয়া হয় এবং এইভাবে পরপর ড্রিলিং পাইপ আস্তে আস্তে ভূগর্ভে প্রবেশ করান হয়। ভূগর্ভে ড্রিলিং বিট যত গভীরে এগোতে থাকে ততই তার ধার কমতে থাকে। ধার কমে গেলে ড্রিলিং বিট বদলিয়ে দেওয়া হয়। ড্রিলিং বিট বদলানো কিঞ্চিৎ শ্রমসাধ্য। কারণ পুরো ড্রিলিং পাইপ তুলে না আনলে বিট বদলানো যায় না। একবার পুরো ড্রিলিং পাইপ তুলে এনে নতুন ড্রিলিং বিট বসিয়ে আবার তা ভূগর্ভে পাঠানো সময় সাপেক্ষও বটে। এবং ড্রিলিং বিট মাঝে মাঝেই পরিবর্তন করতে হয়। যে কারণে ভূগর্ভে তিন হাজার মিটার যেতে ৬০ থেকে ১০০টি ড্রিলিং বিট প্রয়োজন

হয়। ড্রিলিং চলবার সময় আরেকটি বিশেষ কাজ অবশ্যই সম্পন্ন করা হয়। তা হল ড্রিলিং পাইপের মধ্য দিয়ে ড্রিলিং মাড (কেমিক্যাল) ভূগর্ভে প্রবেশ করান হয়। ড্রিলিং মাড নামক এই রাসয়নিক পদার্থটি ভূগর্ভে প্রবেশ করানোর উদ্দেশ্যে ত্রিমুখী। প্রথমতঃ ড্রিলিং মাড-এর সাহায্যে নীচের পাথরের নমুনা সংগ্রহ সহজ। দ্বিতীয়তঃ এই পদার্থটি বিট-এর পাশ দিয়ে গিয়ে বিট নতুন পাথর কাটার পূর্ব মুহূর্তেই পাথরের উপর একটা প্রলেপ হিসাবে ছড়িয়ে যায়; এতে ড্রিলিং বিট পাথর কাটবার সময় চার পাশের পাথর ধ্বসে পড়তে পারে না; তৃতীয়তঃ এর প্রভাবে ড্রিলিং বিট ঠাণ্ডা থাকে। কারণ ড্রিলিং বিট পাথর কাটবার সময় প্রচণ্ড গরম হয়ে যায়।

ড্রিলিং এর কাজ অর্থাৎ খনন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে পেট্রোলিয়াম-এর স্তরে পৌঁছান মাত্র একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ভূগর্ভে পেট্রোলিয়াম যেখানে থাকে সেখানে পেট্রোলিয়ামের উপরে থাকে প্রাকৃতিক গ্যাস; এই গ্যাস প্রচণ্ড চাপে থাকে। তাই হঠাৎ করে বহির্গমনের পথ পাওয়া মাত্রই সেই পথ দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে পড়তে চায়; সেই পথ হল ড্রিলিং পাইপ। ড্রিলিং মাড-এর প্রয়োজনীয়তা এই সময় আর একবার অনুভূত হয়। ড্রিলিং মাড গ্যাসের যাত্রা পথ বন্ধ করে। ফলে প্রচুর গ্যাস অপচয় বন্ধ হয়।

এইবার শেষ পদক্ষেপ। ড্রিলিং পাইপ তুলে ফেলে সেখানে বসানো হয় লম্বা সরু নল। এই পাইপটিতে অনেক ভাল্‌ভ থাকায় পাইপটি সুনিয়ন্ত্রিত হয়। এই পাইপটির নাম "ক্রিসমাস ট্রি"। ক্রিসমাস ট্রি প্রকৃতপক্ষে পেট্রোলিয়াম কূপ থেকে পেট্রোলিয়াম উত্তোলক যন্ত্র। প্রথম পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রোলিয়াম স্তরে থাকায় গ্যাসের চাপেই পেট্রোলিয়াম উপরে উঠে আসে। কিন্তু গ্যাস নিঃশেষিত হলে সমস্যা সৃষ্টি হয়। তখন হয় পাম্পের সাহায্যে না হয় বাইরে থেকে গ্যাস ভূগর্ভে পাঠিয়ে চাপ সৃষ্টি করে পেট্রোলিয়াম উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়।

ভূগর্ভ থেকে সংগৃহীত পেট্রোলিয়াম সম্পূর্ণ অপরিশোধিত। এই অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম বা ক্রুড অয়েল জলের চেয়ে হাল্কা। ক্রুড অয়েলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ০.৭৬ থেকে ০.৯৮। ক্রুড অয়েল হাল্কা সবুজ, হলুদ, গাঢ় বাদামী, কালো বিভিন্ন রং-এর হয়। ক্রুড অয়েল অন্ধকারেও চকচক করে। ক্রুড অয়েল শুধুমাত্র কার্বন এবং হাইড্রোজেনের যৌগিক পদার্থ নয়; এর সঙ্গে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, নিকেল প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই সব পদার্থ

অপসারণ করা হয়। আংশিক পাতন প্রক্রিয়ায় ক্রুড অয়েল পরিশোধনের সময় বিভিন্ন ধাপে পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল প্রভৃতি পাওয়া যায়। পরিশোধনের তলানি হিসাবে সাধারণতঃ প্যারাফিন ও ন্যাপথা জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। তলানির উপর ভিত্তি করে পেট্রোলিয়ামের শ্রেণী বিভাগ হয়। প্যারাফিন জাতীয় পেট্রোলিয়াম বেশী সুবিধাজনক। কারণ পরিশোধন সহজ এবং উপজাত সামগ্রী তৈরীর সুযোগ এই জাতীয় পেট্রোলিয়ামে বেশী থাকে। সব ধরনের অপরিশোধিত পেট্রোলিয়ামে কিছুটা (শতকরা ১০ ভাগ) বেন্‌জিন থাকে।

পেট্রোলিয়াম উত্তোলনের সময় প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস সংগ্রহর জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। তাছাড়া ভূগর্ভে অয়েল ট্র্যাপে প্রাকৃতিক গ্যাস এককভাবে থাকে না। অয়েল ট্র্যাপে প্রাকৃতিক গ্যাস থাকে পেট্রোলিয়ামের উপরে। সুতরাং পেট্রোলিয়াম পরিশোধনের সময় যেটুকু গ্যাস পাওয়া যায় তা সঞ্চয় করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন। এ ছাড়া কিছু ইথেন, প্রপেন, বিউটেন প্রাকৃতিক গ্যাসে থাকে। সামান্য পরিমাণে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং কিছু বিরল গ্যাসও প্রাকৃতিক গ্যাসে থাকে। প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রোলিয়ামের উপরে থাকলেও কিছু প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রোলিয়ামে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। পৃথিবীতে মোট ২০ লক্ষ ৯ হাজার কোটি ব্যারেল [১ ব্যারেল = ১৬০ লিটার (প্রায়)] পেট্রোলিয়াম মজুত আছে বলে মনে করা হয়। তার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে ৩০ হাজার কোটি ব্যারেল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে ৫০ হাজার কোটি ব্যারেল, আফ্রিকায় ২৫ হাজার কোটি ব্যারেল ল্যাটিন আমেরিকায় ২২ হাজার ৫০০ কোটি ব্যারেল, ২০ হাজার কোটি ব্যারেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ৯ হাজার ৫০০ কোটি ব্যারেল কানাডায় ও ২ হাজার কোটি ব্যারেল ইউরোপে এবং বাদবাকি ২০ হাজার কোটি ব্যারেল দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির ভূগর্ভে সঞ্চিত আছে বলে মনে করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ জেনে রাখা ভাল এক মেট্রিকটন ক্রুড অয়েল বা অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম থেকে ৯১ লক্ষ কিলো ক্যালরি তাপ শক্তি পাওয়া যায়। আর এক মেট্রিকটন পেট্রোল, ফার্নেস অয়েল প্রভৃতি থেকে ১ কোটি ৫ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোক্যালরি তাপ শক্তি পাওয়া যায়।

টারস্যাণ্ড বা অয়েল সেল থেকে কিছু তেল পাওয়ার সুযোগ আছে ; টারস্যাণ্ড হল এক ধরনের বালি। কানাডার অ্যালবার্টায় এবং ভেনিজুয়েলার বিস্তীর্ণ এলাকায়

এই ধরনের তেল যুক্ত বালি ছড়ানো আছে। কানাডার দুটি কারখানায় এই বালি থেকে বছরে ১ কোটি টন পেট্রোলিয়াম নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অয়েল সেল হল জৈব পদার্থ কোরাজেন যুক্ত এক প্রকার শিলা। ৩০০ থেকে ৪০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপ মাত্রায় কোরাজেন তেল ও গ্যাসে ভেঙ্গে যায়। এই তেল পেট্রো-লিয়ামজাত তেলের মত ব্যবহারযোগ্য, তবে অবশ্যই পরিশোধন প্রয়োজন। ইতালীতে সপ্তদশ শতাব্দীতে এই তেল দিয়ে রাস্তার আলো জ্বালানো হত। ফ্রান্সে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অয়েল সেল নিষ্কাশন করে তেল সংগ্রহর কারখানা স্থাপিত হয়। স্কটল্যাণ্ডেও অয়েল সেল থেকে তেল সংগৃহীত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যাপক পরিমাণে অয়েল সেল তেল ব্যবহৃত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনে অয়েল সেল পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। অনুমান করা হয়,—পৃথিবীতে যে পরিমাণ কোরাজেন যুক্ত পাথর অর্থাৎ অয়েল সেল আছে তা থেকে হয়ত ভূগর্ভে সঞ্চিত পেট্রোলিয়ামের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ ব্যবহারযোগ্য তেল পাওয়া যাবে। কিন্তু অয়েল সেল থেকে ব্যবহারযোগ্য তেল নিষ্কাশনের পদ্ধতি জটিল এবং যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ। সুতরাং অয়েল-সেলের ব্যপক ব্যবহারের কথা এখনও চিন্তার বাইরে।

শক্তি উৎস হিসাবে পেট্রোলিয়ামের ব্যপক ব্যবহার খুব বেশী দিন চালু না হলেও, এর ব্যবহারের ব্যপ্তি একে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যাতে পেট্রো-লিয়াম ছাড়া চলার কথা এখন ভাবাও যায় না। তাই পেট্রোলিয়াম যতই ফুরোচ্ছে, ততই চিন্তা বাড়ছে।

চার

গ্যাস

গ্যাস একটি পরিচিত শক্তি উৎস। উন্নত দেশগুলোতেই এর ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বেশী। শিল্পায়নের সুযোগ সুবিধা যে সব দেশ পাচ্ছে সেই সব দেশেই গ্যাস অন্যতম শক্তি উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গ্যাস মূলতঃ জ্বালানী রূপে ব্যবহৃত হয়ে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং—বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ব্যবহৃত হয়।

গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ গ্যাসের ব্যবহার খুব সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ গ্যাস ব্যবহারে কোন ছাই সৃষ্টি হয় না। তৃতীয়তঃ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের সময় গ্যাসের প্রজ্জলন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সহজ। চতুর্থতঃ গ্যাস খুব সহজেই পরিবহন যোগ্য। পঞ্চমতঃ গ্যাসের তাপীয় শক্তি অত্যন্ত বেশী। কঠিন ও তরল জ্বালানী ব্যবহারের সময় যত তাপ পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশী তাপ গ্যাসীয় জ্বালানী থেকে পাওয়া যায়। ষষ্ঠতঃ গ্যাসের দহন অপেক্ষাকৃত কম অক্সিজেনেও সম্ভব। সপ্তমতঃ গ্যাস ব্যবহারে পরিবেশ অপেক্ষাকৃত কম দূষিত হয়। অষ্টমতঃ কৃত্রিম উপায়ে গ্যাস উৎপাদনের জন্য নিম্নতম মানের কঠিন জ্বালানীও ব্যবহার যোগ্য। গ্যাসীয় জ্বালানীকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাকৃতিক গ্যাস, ২। প্রোডিউসার গ্যাস (যে গ্যাস কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা হয়)। ৩। বাই-প্রোডাক্ট গ্যাস (উপজাত গ্যাস অর্থাৎ যে গ্যাস অন্য সামগ্রী উৎপাদনের সময় পাওয়া যায়)।

প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় ভূগর্ভ থেকে। বিভিন্ন খনিজ পদার্থর মত প্রাকৃতিক গ্যাসও পৃথিবীর অভ্যন্তরেই থাকে। পৃথিবীর ভিতরের প্রচণ্ড চাপ এবং তাপই এই ধরনের গ্যাস সৃষ্টির মূল কারণ। সুগভীর কূপ খনন করে প্রাকৃতিক গ্যাস সংগ্রহ করা হয়। এ পর্য্যন্ত দেখা গেছে, যে সমস্ত কূপ থেকে পেট্রোলিয়াম আহরণ করা হয় তার সব কটি থেকেই কিছু পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাসও পাওয়া যায়। কিন্তু তা বলে সমস্ত গ্যাস উত্তোলনকারী কূপ থেকে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক গ্যাসকে রাসায়নিক ধর্মর দিক দিয়ে বিচার করলে মিথেন

গ্যাস হিসাবে অভিহিত করতে হয়। ভূগর্ভের যে সব স্তরে কেবলমাত্র গ্যাসই থাকে তেল থাকে না সেই সব স্তরের গ্যাসে শতকরা ৬০ থেকে ৯৫ ভাগ পর্যন্ত মিথেন গ্যাস থাকে। বাদবাকীটুকু ইথেন। তবে এই ধরনের প্রাকৃতিক গ্যাসে ইথেন সর্বোচ্চ পর্যায়ে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত থাকতে পারে। বাদবাকীটা কোন উচ্চ-মানের হাইড্রোকার্বন থাকে। এই অনুপাত মোটামুটি নির্দিষ্ট থাকে। এই ধরণের প্রাকৃতিক গ্যাস বর্ণ বিহীন এবং বিষাক্ত নয়। এই ধরণের গ্যাস এক হাজার ঘনমিটার ব্যবহার করে ৯৩ লক্ষ ৫০ হাজার কিলো ক্যালরি তাপশক্তি পাওয়া যায়। বহুদূর পর্যন্ত এই গ্যাস পরিবহণ করা যায়।

আর যে সব তৈলকূপে তেলের স্তরের উপরে গ্যাস থাকে সেই ধরণের প্রাকৃতিক গ্যাস-এ মিথেন প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক বেশী পরিমাণে থাকলেও পরে তার অনুপাত কমতে থাকে।

এখনও পর্য্যন্ত সংখ্যাতত্ত্বর হিসাব অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে মোট প্রাকৃতিক গ্যাস মজুতের পরিমাণ হল ৭২ লক্ষ ৩৬০ হাজার কোটি ঘন মিটার। এখনও পর্যন্ত যে হারে গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে এই গ্যাসে আরও ২৫০-৩০০ বছর চলে যাবার কথা। কিন্তু খেয়াল রাখা দরকার যে, উন্নত দেশগুলি ছাড়া বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশেও গ্যাসের ব্যবহার ক্রমশই বাড়ছে। প্রোডিউসার গ্যাস বলতে বুঝায় কৃত্রিম জালানী গ্যাস। প্রোডিউসার গ্যাস-এ কার্বন-মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন এবং সামান্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকে। যে সমস্ত কঠিন পদার্থে শতকরা ৫০ ভাগ বা তারও বেশী পরিমাণ কার্বন থাকে সেই সমস্ত পদার্থ বাতাসে আংশিক দহন করলে প্রোডিউসার গ্যাস পাওয়া যায়।

উপজাত গ্যাস বা বাই-প্রোডাক্ট গ্যাস পাওয়া যায় মূলতঃ ব্লাস্ট ফার্নেস এবং কোক ওভেন থেকে। ব্লাস্ট ফার্নেস-এ আকরিক থেকে লোহা নিষ্কাশনের সময় বাই-প্রোডাক্ট গ্যাস পাওয়া যায়। এই ধরণের গ্যাস দাহ্য। ব্লাস্ট ফার্নেসে ব্যবহৃত প্রতি কিলোগ্রাম কয়লায় ০·৬ ঘন মিটার গ্যাস পাওয়া যায়। কোক ওভেনে কয়লা থেকে কোক প্রস্তুতের সময় কয়লার উর্দ্ধপাতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপজাত উপাদান হিসাবে কোল গ্যাস পাওয়া যায়। এই গ্যাস দাহ্য। কোল গ্যাসের মূল উপাদান মিথেন ও হাইড্রোজেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ভারতে ৮ হাজার ৯৫২ ঘন মিটার প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চিত আছে বলে অনুমান করা হয়।

পাঁচ

জল

জলের সাথে জন্ম থেকে আমাদের পরিচয়। জীবনের সাথে জলের সম্পর্কের নিবিড়তা আমরা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে পেয়ে থাকি। আবার জলের মারণলীলার সাথেও আমাদের পরিচিতি আছে। বন্যার তাণ্ডব সৃষ্টিতে জলের অবদান নতুন করে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। বেঁচে থাকার জন্য শারীরিক প্রয়োজনে জলের উপযোগিতা ছাড়াও জলের প্রবল স্রোতকে মানব সভ্যতার প্রয়োজনে প্রয়োগের পদ্ধতিও মানুষ অনেকদিন থেকে ব্যবহার করে আসছে। তবে জলের স্রোতের ধর্ম প্রথম উদ্ভাবন করেন ড্যানিয়েল বারনৌলি। বারনৌলির আগে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের আগেও জলস্রোত মানব সভ্যতার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হলেও তার সুষ্ঠু ও ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব ছিল না। সেন্ট পিটার্সবুর্গ অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স-এর অধ্যাপক বারনৌলি জলস্রোতকে তিনটি বিশেষ ভাগে ভাগ করেন। জলগতিবিদ্যা সম্পর্কিত তাঁর সমীকরণ-এর উপর ভিত্তি করেই জলের ক্ষমতার ব্যবহার এত এগোতে পেরেছে।

প্রবাহিত জলস্রোতের শক্তির তিনটি অংশ আছে, গতিশক্তি, স্থিতিশক্তি এবং জলের মধ্যে স্থিতিশীল চাপের জন্য সৃষ্ট গতিশক্তি। বারনৌলির সমীকরণ অনুযায়ী প্রবাহিত জলের সামগ্রিক শক্তি এই তিনটি অংশের যোগফলের সাথে সমান। প্রবাহিত জল স্রোতের শক্তিকে প্রধানতঃ বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরের কাজে ব্যবহার করা হয়। প্রবাহিত জলস্রোতের শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি তেমন দুর্বোধ্য নয়। যান্ত্রিক ও চৌম্বক শক্তির সমন্বয়ে এই দুই প্রকার শক্তিকে অত্যন্ত সহজে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। কোন নির্দিষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে যদি যান্ত্রিক শক্তির প্রয়োগে কোন বিদ্যুৎ পরিবাহীকে ঘুরান যায় তবে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়। যে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন নির্দিষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিবাহীকে বলের সাহায্যে ঘুরিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা যায় তাকে বলে জেনারেটর। প্রবাহিত জলস্রোত থেকে যান্ত্রিক শক্তি সংগ্রহ করে চৌম্বক

শক্তির সমন্বয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় বলে এই ধরণের বিদ্যুৎ জলবিদ্যুৎ নামে পরিচিত। আর প্রবাহিত জলস্রোত থেকে যান্ত্রিক শক্তি আহরণের কাজটি করা হয় যে যন্ত্রের মাধ্যমে তার নাম টারবাইন। এটি এমন একটি যন্ত্র যা বলের প্রয়োগে ঘুরতে পারে। টারবাইন একটি চাকার আকৃতি সম্পন্ন যন্ত্র যা একটি অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরতে পারে। এর গায়ে বেশ কিছু ব্লেড কেন্দ্রের সাথে নির্দ্দিষ্ট কোনে বসান থাকে। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জল এই ব্লেডগুলির উপর পড়লে টারবাইন ঘোরে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য টারবাইন ঘুরাবার জন্য প্রয়োজনীয় বল পাওয়া যায় প্রবাহিত জলস্রোত থেকে। টারবাইন সংযুক্ত থাকে জেনারেটরের সাথে। জেনারেটরের মধ্যে থাকে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরীর ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের বর্তনী। টারবাইন প্রবাহিত জলস্রোতের আঘাতে ঘুরতে শুরু করলেই তার সাথে সংযুক্ত থাকার জন্য জেনারেটরের মধ্যে অবস্থিত তারের বর্তনী ঘুরতে শুরু করে। জেনারেটরের মধ্যে তারের বর্তনী ঘুরবার ব্যবস্থা থাকে। এদিকে জেনারেটরের অপর অংশে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরীর ব্যবস্থা থাকায় বিদ্যুৎ উৎ-পাদন শুরু হয়। জলস্রোত থেকে যে পরিমাণ বল পাওয়া যায় তার উপর ভিত্তি করেই কোন নির্দিষ্ট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পর টারবাইন ও জেনারেটর নির্মাণ করা হয়। টারবাইন ঘুরলে জেনারেটর ঘুরবে আর জেনারেটর ঘুরলেই পাওয়া যাবে বিদ্যুৎ,—এ ব্যাপারটি সরল হলেও, বিষয়টি অনুধাবন করা সহজ হলেও টারবাইন ঘুরানোর জন্য জলস্রোতের শক্তি ব্যবহারের ব্যাপারটি কিন্তু সহজ নয়।

প্রথমতঃ যে কোন জলস্রোতের সাহায্যে টারবাইন ঘুরান যায় না।

দ্বিতীয়তঃ যেখানে জলস্রোতের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব সেই জায়গাটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে যথার্থ নাও হতে পারে। বিষয়টা একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক।

সমতলে বয়ে যাওয়া জলস্রোত থেকে অনেক বেশী বল সৃষ্টি করে পতনশীল জল প্রবাহ। আর যত বেশী বল জলস্রোত থেকে সংগ্রহ করা যাবে তত জোরে টারবাইন ঘোরান যাবে। আবার বেশী বলের সাথে সমতা রেখে অনেক বড়মাপের টারবাইন ঘোরান যেতে পারে। আর জেনারেটর যেহেতু টারবাইনের আকার এবং ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল অতএব প্রবাহিত জলের বলের উপর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা নির্ভর করবে। অর্থনৈতিক দিকটার দিকে দেখার প্রয়োজন দ্বিবিধ। এমন কোন জল প্রবাহর উপর ভিত্তি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রর স্থান বেছে নেওয়া হয়

না, যেখানে জলপ্রবাহের গতি কম। কারণ এরকম করা হলে টারবাইন, জেনারেটর ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির জন্য ব্যয় করে কম বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। সুতরাং উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাবে। আবার যে জায়গায় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জল প্রবাহ ব্যবহারের সুযোগ আছে সেই জায়গায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে তাকে বিদ্যুৎ ব্যবহারের অঞ্চলে পরিবহনের জন্য যদি প্রচুর ব্যয় হয় তাহলেও বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাবে। সুতরাং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচন অত্যন্ত গুরুতর কাজ। প্রাথমিক পর্য্যায়ে মাথায় রাখা হয় নূন্যতম ব্যয়, সর্বোচ্চ কার্যক্ষমতা।

কোন নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে বেশী বল সংগ্রহ করা হল উদ্দিষ্ট লক্ষ্য। যে জায়গা থেকে জল নীচে পড়ে এবং যেখানে পতিত হয় এই দুই জায়গার মধ্যবর্তী দূরত্বকে বলে জলের হেড। হেড বেশী হলে জলস্রোতের থেকে বেশী বল সংগৃহীত হয়। সাধারণতঃ পাহাড়ী অঞ্চলে জল উঁচু জায়গা থেকে নীচে পড়ে কিন্তু সবসময় প্রাকৃতিক এই সুবিধা পাওয়া সম্ভব নয়। তখন ভাবতে হয় কৃত্রিম উপায়ের কথা, কৃত্রিম উপায় হল বাঁধ। বাঁধ দিয়ে যদি জল আটকান যায় সেই জলকে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে ব্যবহারের সুযোগ থাকে।

বাঁধের ধারণা অথবা বাঁধের ব্যবহার কিন্তু আধুনিক নয়। সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানব সমাজে বাঁধের প্রচলন আছে। প্রথমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পরবর্তীতে সেচের কাজেই বাঁধের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। আরও পরে বাঁধের সঞ্চিত জল দিয়ে জলসরবরাহের কাজও শুরু হয়। তারপর জলবিদ্যুৎ সংক্রান্ত ধারণা, ভাবনা সক্রিয় হবার পর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজেও বাঁধের প্রচলন শুরু হয়। বাঁধের প্রধান প্রয়োজন হল প্রবাহিত জলরাশির গতিরোধ করা। প্রবাহিত জলরাশির গতিরুদ্ধ হলেই সেই জলরাশি বাঁধের পাশে সঞ্চিত হতে থাকে। বাঁধের পাশে এই জল জমতে জমতে বাঁধের উচ্চতাকেও অতিক্রম করে যেতে পারে। সুতরাং বাঁধ তৈরির সময় দেখতে হয় যে,—যে জায়গায় বাঁধ তৈরী হচ্ছে সেই এলাকায় বাঁধ তৈরীর আগের একশ বছরে কি পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছিল। খেয়াল রাখতে হয় প্রবাহিত জলস্রোতের পরিমাণ কত। যেহেতু বাঁধের প্রধান কাজ প্রবাহিত জলস্রোতের গতিরোধ করা, অতএব বাঁধ নির্মাণের সময় নজর রাখতে হয় প্রবাহিত জলস্রোত এবং সঞ্চিত জলস্রোত কি পরিমাণ চাপ সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং বাঁধ তৈরির মালমশলা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও নজর রাখতে হয় ; নজর রাখতে হয় বাঁধের উচ্চতার উপর ; কারণ বাঁধের সঙ্গে খুব সঙ্গত কারণেই জলাধার সংশ্লিষ্ট।
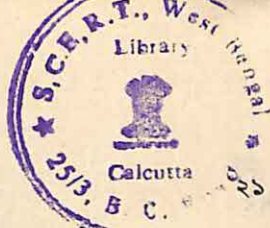
জলাধারে সঞ্চিত জলের সর্বোচ্চ উচ্চতার চেয়ে বাঁধের উচ্চতা বেশী হওয়া প্রয়োজন। যেখানে বাঁধ দেওয়া হয় তার পাশে সঞ্চিত জলের পরিমাণ পূর্ববর্তী তথ্য থেকে হিসেব করে জলাধারের আয়তন নির্বাচন করা হয়। জলাধার বাঁধের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। কারণ, জলাধারের সঞ্চিত জলই নিয়ন্ত্রিত গতিতে ব্যবহার করা হয়। তা সে বন্যা নিয়ন্ত্রণই হোক বা সেচের কাজেই হোক, হোক না তা জল সরবরাহর কাজ কিংবা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ।

ব্যবহারের কথা সামনে রেখে বাঁধের পরিকল্পনা হয়। কোন বাঁধ শুধুমাত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণে অথবা কেবলমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নির্মাণ করা যায়। আবার একই বাঁধ বহুমুখী কার্যে ব্যবহার করা যায়। যেমন ভারতের ডি. ভি. সি. র বাঁধগুলি (পাঞ্চেৎ, মাইথন) একাধারে দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণে, সেচের কাজে এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে আবার জল সরবরাহর (দুর্গাপুর অঞ্চলে) কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাঁধের নির্মাণ কৌশল, তার প্রয়োজনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বাঁধের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করা হয়। তবে সে প্রসঙ্গে আপাতত না যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন পর্যাপ্ত হেড-বিশিষ্ট জল প্রবাহ। এই জলপ্রবাহ সরাসরি নদী থেকে অথবা বাঁধের জন্য সৃষ্ট জলাধারের জল থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। ব্যবহারযোগ্য জলকে 'ইনটেক' এবং 'ফোরবে'র মাধ্যমে 'পেনস্টকে' পাঠানো হয়।

ইনটেকের কাজ হল ব্যবহারযোগ্য জলকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জেনারেটরের দিকে পাঠানো। ইনটেকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল জলের সঙ্গে বহে আসা পাথর, বালিসহ বিভিন্ন দ্রব্য এবং বরফের টুকরোকে (শীতের দেশে) আটকানো। ফোরবে হল ইনটেকের ঠিক উপরে অবস্থিত জলের আয়তন বিবর্ধনকারী একটি ব্যবস্থা অর্থাৎ জল যেখান থেকে যেভাবেই আসুক না কেন ফোরবে সেই জলের আয়তনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। জল যদি খুব সরু হয়ে আসে তা হলেও ইন-টেকে জল যে আকারে যাবে, মোটা হয়ে এলেও জলের আয়তন একই থাকে। ফোরবে জলের আয়তনের সমতা রক্ষা করে। ফোরবে আর ইনটেকের মাধ্যমে আগত জলকে টারবাইনে নিয়ে যাবার জন্য একটি সুসংবদ্ধ পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন। এই ব্যবস্থাকে বলে পেনস্টক। পেনস্টক নির্মাণের সময় জলের গতি সম্পর্কে অবহিত থাকতে হয়; কারণ, জল কিরকম চাপে ব্যবহার করা হবে

অর্থাৎ উচ্চচাপে কিংবা নিম্নচাপে তার উপর নির্ভর করে, পেনস্টকের গঠন প্রণালী এবং নির্মাণ পদ্ধতি। জলকে যদি নিম্নচাপে টারবাইনে প্রয়োগ করতে হয় তবে মোটা পেনস্টক আবার জলকে উচ্চচাপে ব্যবহার করলে সরু পেনস্টক ব্যবহার করা হয়। নিম্নচাপের ক্ষেত্রে পাকা নালা দিয়ে পেনস্টক তৈরি করা হয়। কিন্তু উচ্চ চাপের ক্ষেত্রে ইস্পাতের নল অপরিহার্য। বিষয়টি অত্যন্ত সাধারণ। একই পরিমাণ জলকে সরু নলকে দিয়ে পাঠালে তা জোরে যায় কিন্তু মোটা নল দিয়ে পাঠালে তার গতি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। পেনস্টক জলকে নির্দ্দিস্ট চাপে পরিবহন করে।

টারবাইন প্রধানতঃ দু ধরণের হয় ; রি-অ্যাকশন টারবাইন (Reaction Turbine) ও ইমপাল্স টারবাইন (Impulse Turbine)। রি-অ্যাকশন টারবাইনে জল প্রচণ্ড চাপে প্রযুক্ত হয়। জলের চাপে সরাসরি টারবাইন ঘুরতে থাকে। টারবাইন ঘুরিয়ে দেওয়ার পর জল ড্রাফ্‌ট্ টিউব মারফৎ বেড়িয়ে যায়। কিন্তু ইমপাল্স টারবাইনে জলের চাপ নজ্‌লের মাধ্যমে গতিতে পরিবর্তিত হয়ে টারবাইনে আঘাত করে। টারবাইন ঘুরিয়ে দেওয়ার পর জল সরাসরি বেড়িয়ে যায়। কোন ড্রাফ্‌ট্ টিউব দরকার হয় না। টারবাইনে কতটুকু জল প্রবেশ করবে তা নিয়ন্ত্রিত হয় নজলের মধ্যে থাকা নিড্‌ল বা থ্রটলিং এর মাধ্যমে। টারবাইনের সঙ্গে সংযুক্ত জেনারেটর, এর ফলে ঘুরতে থাকে। বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবিটি (প্রস্থচ্ছেদ ছবি বা cross section diagram) ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলেই বিষয়টি বোধ হয় আরও ভালভাবে অনুধাবন করা যাবে। ছবির ১ এবং ২ চিহ্নিত অংশটি হল ইনটেক, ৩ চিহ্নিত অংশটি হল পেনস্টক, ৭ চিহ্নিত অংশ হল জেনারেটর। যদি কখনও প্রয়োজন হয় তখন ৬ চিহ্নিত অংশটি যাকে বলে 'ইমারজেন্সী গেট',—খুলে দেওয়া হয়। মধ্যবর্তী যে সব যন্ত্রাংশর প্রস্থচ্ছেদ দেখান হয়েছে সেগুলি অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ। জলের নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া, টারবাইন ও জেনারেটর সহ সমস্ত উৎপাদন কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এইসব যন্ত্রাংশ ব্যবহৃত হয়। HWL এবং TWL,—এদের বলে হেড ওয়াটার লেভেল এবং টেল ওয়াটার লেভেল HWL হল জল প্রবেশের মাত্রা আর TWL হল জল বেরিয়ে যাবার মাত্রা। অর্থাৎ জল HWL থেকে TWL-এ যেতে যে কাজটুকু করে তা হল জলের শক্তির বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিবর্তন।

এবার বিবেচনা করা দরকার জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রর স্থান নির্বাচনের পক্ষে
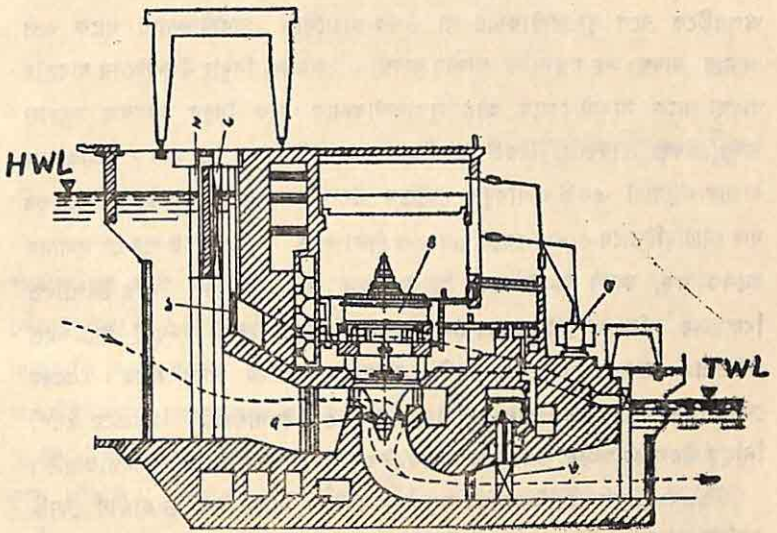
জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র (প্রস্থচ্ছেদ ছবি)

প্রয়োজনীয় শর্ত কি কি হওয়া উচিত। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এতক্ষণ যে ধারণা পাওয়া গেল তা থেকে এটা পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রর জন্য যথেষ্ট জল দরকার এবং সেই জলের যেন পর্য্যাপ্ত হেড থাকে। জলের যোগান যথেষ্ট রাখার জন্য যে জলাধারটি দরকার তা নির্মাণের জন্য উপযুক্ত জায়গা যেন পাওয়া যায়। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাঁধ, জলাধার এসব গড়ে তোলার জন্য জায়গা যেমন দরকার তেমনি এগুলি তৈরীর মশলা যেন সহজ-প্রাপ্য হয়; নির্বাচিত স্থানটিতে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত থাকা উচিত। আর দেখা উচিত যে এলাকায় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কথা ভাবা হচ্ছে সেখান থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহার করার জায়গার দূরত্ব যেন খুব একটা বেশী না হয়। তা হলে খরচ বেড়ে যাবে। প্রধানতঃ এই শর্তগুলির উপর নজর রাখলেও সবচেয়ে বেশী যে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা দরকার তা হল আর্থিক দিক। অর্থাৎ এহেন একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র অর্থনৈতিক দিক থেকে সফল হবে কিনা সেটা পাশাপাশি সব সময়ই দেখতে হয়।

জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটি ভাগে বিভক্ত। একটিকে বলে সাবস্ট্রাকচার বা ভিত্তি অপরটিকে বলে সুপারস্ট্রাকচার বা উপর-কাঠামো। সাবস্ট্রাকচারে থাকে জল আনার ব্যবস্থা সহ যন্ত্রপাতি থাকার ব্যবস্থা। অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদনের যাবতীয় ব্যবস্থা থাকে সাবস্ট্রাকচারে আর সুপারস্ট্রাকচারে থাকে বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা। একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ব্যয় কত? আজকের বাজার অনুযায়ী একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত এক কিলোওয়াট বিদ্যুতের দাম মোটামুটিভাবে ৩০০০ থেকে ১০০০০ টাকা পড়ে। বিদ্যুতের দাম সে তুলনায় অনেক কম, কারণ একটা জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র চলে দীর্ঘদিন। আর উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমান ১ কিলোওয়াট-এর চেয়ে অনেক বেশী। তাই দামে এত তারতম্য। ভারতে এখন মোঁট ৮৭টি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে। এদের মোট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা ১০ হাজার ৮৩২ মেগাওয়াট। সবচেয়ে বেশী নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা কর্ণাটকের সারাবতী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রর (৮৯৯ মেগাওয়াট)।

১৯৭৮-এর সরকারী সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতে বছরে প্রায় ৪ হাজার কোটি ইউনিট (KWH) জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা আছে।

ছয়

পারমাণবিক শক্তি

পারমাণবিক শক্তি বলতে প্রথমেই মনে আসে পারমাণবিক বোম বা অ্যাটম বোমের কথা। ১৯৪৫-এর ৬ই এবং ৯ই আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি সহরে অ্যাটম বোমের বিস্ফোরণ হয়। বলা যায় যে ১৯৪৫ এর ৬ই আগস্টই মানুষ প্রথম প্রত্যক্ষ করে পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে। তারও আগে পরমাণু নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। গবেষণাগারে প্রত্যক্ষ করা গেছে পরমাণু-জাত শক্তিকে। কিন্তু পরমাণু শক্তির তীব্রতা ধ্বংসের মাধ্যমে প্রথম সাধারণ্যে প্রদর্শিত হয়। মানব কল্যাণে, সভ্যতার প্রয়োজনে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার প্রথম শুরু হয় ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৫৪-এর ২৪ শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়নের ওবনিনৃস্ক-এ বিশ্বের প্রথম পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরের ব্যবস্থা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পারমাণবিক শক্তি বা অ্যাটমিক এনার্জি এবং নিউক্লিয়ার শক্তি, বা নিউক্লিয়ার এনার্জি মূলতঃ সমার্থক হিসাবেই প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। শক্তির জগতে নবীন এহেন শক্তির বিকাশের ব্যাপারটি একটু খতিয়ে দেখলে পারমাণবিক শক্তি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি আহরণের প্রক্রিয়াগুলো বুঝতে কিঞ্চিৎ সুবিধা হয়। আমাদের চারধারে যে সব জিনিষপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তারা প্রত্যেকেই ১০৩টি মৌলিক পদার্থের কোন একটি (অথবা একাধিক মৌলিক পদার্থের সমন্বয়)। যে কোন মৌলিক পদার্থকে ভাঙতে ভাঙতে শেষ যে অবস্থায় পৌঁছানো যায়, যে কণার মধ্যে পদার্থের ধর্ম বজায় থাকে তাকে বলে পরমাণু বা অ্যাটম। প্রতিটি মৌল বা মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ধর্ম আলাদা।

পরমাণু অবিভাজ্য,—এই তত্ত্ব বাতিল হয়েছে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে। পরীক্ষায় দেখা গেল পরমাণু বিভাজ্য। পরমাণুকে ভেঙ্গে দেখা গেল পরমাণুর দুটো

অংশ আছে। অন্তর্দেশ ও বহির্দেশ। অন্তর্দেশকে বলে নিউক্লিয়াস। আর বহির্দেশ,— নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে কক্ষপথ ধরে ঋণাত্মক আধানযুক্ত বা নেগেটিভ চার্জযুক্ত আরও কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা ঘুরে বেড়ায়, এদের বলে ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে পাওয়া যায় প্রোটন ও নিউট্রন নামে দুরকম মৌলিক কণা। প্রোটন ধনাত্মক আধান-যুক্ত বা প্রোটনের পজিটিভ চার্জ আছে। আর নিউট্রনের কোন আধান নেই। অর্থাৎ নিউট্রন পুরোপুরি চার্জবিহীন। প্রোটন ও নিউট্রনের ওজন প্রায় সমান; নিউক্লিয়াসের ভরের একক হিসাবে একটি বিশেষ একক ব্যবহৃত হয়। একে বলে অ্যাটমিক মাস ইউনিট (এ. এম. ইউ.) বা পারমাণবিক ভর একক। এই একক অনুযায়ী ১ এ. এম. ইউ $= ১.৬৫৯৮ \times ১০^{-২৪}$ গ্রাম বা $\frac{১৬৫৯৮}{১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০}$ গ্রাম। এই একক অনুয়ায়ী প্রোটন আর নিউট্রনের ভর যথাক্রমে ১.০০৭৯৭ এ.এম.ইউ এবং ১.০০৮৬৬৫ এ.এম.ইউ। ইলেক-ট্রনের চেয়ে প্রোটন এবং নিউট্রন ২ হাজার গুণ ভারী অর্থাৎ ইলেকট্রনের ওজন প্রায় নেই। সুতরাং পরমাণুর ভর নির্ভর করে সম্পূর্ণতঃ প্রোটন ও নিউট্রনের উপর। একটি ইলেকট্রনের বৈদ্যুতিক আধান হল ১.৬০২×১০^{-১১} কুলম্ব ঋনাত্মক বা নেগেটিভ ইলেকট্রিক চার্জ। আর একটি প্রোটনের বৈদ্যুতিক আধান হল ১.৬০২×১০^{-১১} কুলম্ব ধনাত্মক বা পজিটিভ ইলেট্রিক চার্জ। প্রোটন ও ইলেকট্রন পরস্পর বিরোধী ও সমান আধান যুক্ত হওয়ায় পরমাণুর কোন আধান নেই।

একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যতগুলি ইলেকট্রন থাকে তার সমান সংখ্যার প্রোটনও থাকে। একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যতগুলি প্রোটন থাকে বা নিউ-ক্লিয়াসের চারপাশে যতগুলি ইলেকট্রন বিভিন্ন কক্ষে ঘুরে বেড়ায় তার উপর নির্ভর করে পদার্থর ধর্ম। অর্থাৎ কোন একটি নির্দ্দিষ্ট মৌলের পরমাণুর বিন্যাস অপরটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন আসে এতগুলি একই আধান যুক্ত কণা একত্রে থাকে কি করে? যে সব পরমাণুর নিউক্লিয়াসে একাধিক প্রোটন থাকে তারা একই জায়গায় সুসংববদ্ধভাবে থাকে কি করে? সাধারণ চিন্তা অনুযায়ী তো তাদের মধ্যে বিকর্ষণ হওয়ার কথা। সাধারণ নিয়মে সম আধানের মধ্যে আকর্ষণ না হয়ে বিকর্ষণ হয় ঠিকই কিন্তু এক্ষেত্রে অন্য এক বিশেষ আকর্ষণী বল কাজ করে। এই বিশেষ আকর্ষণী বলের প্রভাবে নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে একটি বন্ধনী তৈরী হয়। এই বিশেষ বলকে বলে নিউক্লিয়ার ফোর্স। এই বল নিউক্লিয়াসের মধ্যেই কার্যকর।

সমস্ত মৌলের নিউক্লিয়ার ফোর্সের মান নির্ণয় করা গেছে। এই বল বা বন্ধন-শক্তি লুকিয়ে থাকে পরমাণুর ভরের মধ্যে। প্রোটন ও নিউট্রনের ভর আলাদা আলাদা করে নিয়ে যোগ করলে যোগফল যা পাওয়া যায় তা পরমাণুর নিজস্ব ভরের চেয়ে কম। সমস্ত মৌলের পরমাণুর ক্ষেত্রেই এই তথ্য সঠিক। এই ঘাটতি ভরটুকু আসলে বন্ধন-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে নিউট্রন ও প্রোটনগুলিকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে ধরে রাখে। এর নাম আকর্ষী বল (Attractive force)। কিন্তু নিউক্লিয়াসের মধ্যে সম আধানযুক্ত একাধিক প্রোটন থেকেই যায়। অতএব প্রোটনগুলির মধ্যে সব সময় একটা বিকর্ষী বলও (Repulsive force) কাজ করে। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে নিউক্লিয়াসে একই সঙ্গে আকর্ষী বল ও বিকর্ষী বল কাজ করছে। আকর্ষী বলের প্রভাবে নিউট্রন, প্রোটন নিউক্লিয়াসের মধ্যে ঘনসংবদ্ধ হয়ে থাকতে চায়। পাশাপাশি প্রোটনের ধনাত্মক আধানের বিকর্ষী বলের প্রভাবে প্রোটনরা কেবল নিউক্লিয়াস থেকে বেড়িয়ে আসতে চায়। যতক্ষণ আকর্ষী বলের প্রভাব বিকর্ষী বলের চেয়ে বেশী ততক্ষন নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্ব বজায় থাকে। কিন্তু বিকর্ষী বল আকর্ষী বলের চেয়ে শক্তিশালী হলেই মুস্কিল। নিউক্লিয়াসের ভারসাম্য নষ্ট হয়। কিন্তু নিউক্লিয়াসের সাথে ইলেকট্রন-এর একটা সম্পর্ক জড়িত থাকায় নিউক্লিয়াস সব সময় স্থায়ী অবস্থায় থাকতে চায়। সুতরাং দু-একটি কণা পরিত্যাগ করে নিউক্লিয়াস তার মধ্যেকার আকর্ষী ও বিকর্ষী বলের মধ্যে সমতা রক্ষার চেষ্টা করে। পদার্থর এই ধর্মকে বলে তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity).

নিউক্লিয়াসের ধর্ম হল স্থায়িত্ব বজায় রাখা। সুতরাং একবার যদি নিউক্লিয়াসকে অস্থির করে তোলা যায় তা হলে নিউক্লিয়াসে তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ বলা যায় পদার্থটি তেজস্ক্রিয় হয়ে যাবে। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয়তা তৈরি করা সহজ নয়। তবে বেশ কিছু মৌলের মধ্যে প্রাকৃতিক কারণেই তেজস্ক্রিয়তা রয়ে গেছে। সেদিক থেকে বলতে গেলে তেজস্ক্রিয়তা শুধু নিউট্রনের একটি বিশেষ গুণই নয়, তেজস্ক্রিয়তা একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। প্রকৃতিতে ইউরেনিয়াম নামে যে মৌলটি পাওয়া যায় সেটিই হল সবচেয়ে ভারী তেজস্ক্রিয় পরমাণু ; ইউরেনিয়ামের পরমাণু থেকে স্বাভাবিক অবস্থাতেই তেজস্ক্রিয়তা বিকিরণ হতে হতে সীসাতে গিয়ে সে একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়।

প্রকৃতিতে প্রাপ্য যে সব মৌলের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তা ধর্ম দেখা যায় তাদের পরমাণুর নিউক্লিয়াসগুলি অস্থির ; অস্থির নিউক্লিয়াস থেকে আলফা, বিটা ও গামা

এই তিন ধরনের রশ্মির (বা তেজস্ক্রিয় কণা সংক্ষেপে তেজকণা) বিকিরণ হয়। একটি তেজকণা বের করে দিলে পুরনো নিউক্লিয়াসটি নতুন নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। কিন্তু একটি তেজকণা বের করে দিলেই নিউক্লিয়াসটি সুস্থির হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। নতুন নিউক্লিয়াসটিও অস্থির হতে পারে। সুতরাং অস্থির নিউক্লিয়াসটি আবার একটি তেজকণা পরিত্যাগ করতে পারে। একই ঘটনা ক্রমাগত চলবে। যতক্ষণ না নিউক্লিয়াসটি সুস্থির হয় ততক্ষণ এই ঘটনা ঘটতে থাকে। এর নাম 'চেন্ রিঅ্যাকশন'। একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভর হল ২৩৮। এর অর্থ একটি ইউরিনিয়াম পরমাণুর অন্তর্গত নিউক্লিয়াসের ভর ২৩৮। পরমাণু ভর ছাড়াও আর একটি শব্দ এই প্রসঙ্গে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। এর নাম পরমাণু অঙ্ক। পরমাণু অঙ্ক পরমাণুতে অবস্থিত প্রোটনের সংখ্যার নির্দ্দেশ দেয়। তার মানে পরমাণু অঙ্ক জানা থাকলে বোঝা যায় পরামাণুতে কটি ইলেকট্রন আছে। কারণ, পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেকট্রন সমান সংখ্যায় থাকে। তা হলে পরমাণু ভর ও পরমাণু অঙ্ক জানা থাকলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে পরমাণুটিতে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা কত। উদাহরণ স্বরূপ অতি পরিচিত মৌল লোহা বা আয়রন নিয়ে চিন্তা করলে দেখব আয়রনের পরমাণু ভর ৫৬ (প্রায়) আর পরমাণু অঙ্ক ২৬ অর্থাৎ একটি লোহার পরমাণুতে ২৬ টি প্রোটন ও ইলেকট্রন আছে আর নিউট্রন আছে ৩০টি। একটি ইউরেনিয়ামের পরমাণু অঙ্ক ৯২। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস অস্থির হবার জন্য একটি আলফা কণা সবার আগে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয় নতুন নিউক্লিয়াস। নতুন নিউক্লিয়াস গঠিত হবার অর্থ পরমাণুর ধর্ম পাল্টিয়ে যাওয়া অর্থাৎ ইউরেনিয়াম পরমাণু পরিবর্তিত হয় নতুন একটি পরমাণুতে যার নাম থোরিয়াম। একটা আলফা কণা নির্গত হবার সাথে সাথে ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভর কমে হয় ২৩৪ আর পরমাণু অঙ্ক কমে হয় ৯০। এরপর এই নতুন নিউ-ক্লিয়াস থেকে বেরিয়ে যায় একটি বিটা কণা। বিটা কণা বেরিয়ে যাবার সময় একটি ঋণাত্মক আধান নিয়ে যায় সুতরাং প্রোটনের সংখ্যা ১ বেড়ে যায় অথাৎ পরমাণু অঙ্ক হয় ৯১। বিটা কণা নির্গমনে নিউক্লিয়াসের ভর তেমন কিছু পাল্টায় না, কিন্তু পরমাণু অঙ্ক পরিবর্তিত হওয়ায় পরমাণুর ধর্ম পরিবর্তিত হয়। নতুন পরমাণুটি প্রোটেক্টিনিয়াম মৌলের ধর্ম পালন করে। অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়তার দৌলতে থোরিয়াম রূপান্তরিত হয় প্রোটেক্টিনিয়াম-এ। এবার এই প্রোটেক্-

টিনিয়াম পরমাণু থেকে একটি বিটা কণা বেরিয়ে গেলে ১টি ঋণাত্মক আধান মুক্ত হয় অর্থাৎ পরমাণু অঙ্ক ১ বেড়ে যায়। অর্থাৎ পরমাণুর ভর ২৩৪ হলেও তার পরমাণু অঙ্ক দাঁড়াচ্ছে ৯২। ৯২ কিন্তু ইউরেনিয়াম পরমাণুর পরমাণু অঙ্ক। এইভাবে ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে আলফা ও বিটা কণা বেরোতে বেরোতে অবশেষে একদিন ইউরেনিয়াম পরমাণু সীসের পরমাণুতে পরিণত হয়। ইউরেনিয়াম পরমাণুর সীসেতে পরিণত হতে কতদিন সময় লাগে তার হিসেব নিয়ে মতানৈক্য আছে। তবে কোন তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস কমতে কমতে যতদিনে অর্ধেক হয় তার একটা সুনির্দ্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। একে বলে অর্ধায়ু। ২৩৮ পরমাণু ভর যুক্ত ইউরেনিয়ামের অর্ধায়ু হল ৪·৭ কোটি বছর।

অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন নির্দিষ্ট মৌলের পরমাণু অঙ্ক নির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও পরমাণুটির পরমাণু ভর বিভিন্ন হয়। অর্থাৎ পরমাণুটির প্রোটনের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকলেও তার নিউট্রনের সংখ্যা পরিবর্তিত হয়। এদের বলে আইসোটোপ। তা হলে বলা যায় যে,—একই পরমাণু অঙ্কের কিন্তু বিভিন্ন পরমাণু ভর বিশিষ্ট পরমাণুদের বলা হয় আইসোটোপ, অর্থাৎ যে মৌলের পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যা সমান হওয়ার জন্য যাদের রাসায়নিক সংখ্যা সমান অথচ নিউট্রনের সংখ্যার বিভিন্নতার জন্য নিউক্লিয়াসের গঠন একই রকম নয় তাদের বলে সেই নির্দ্দিষ্ট মৌলের আইসোটোপ।

মৌলের আইসোটোপ থাকার দরুন মৌলকে কেবলমাত্র রাসায়নিক প্রতীক দিয়ে নামাঙ্কিত করলেই হয় না। আইসোটোপ দিয়ে নির্দ্দেশ করতে হয় কোন নির্দ্দিষ্ট মৌলের কোন বিশেষ পরমাণুর রাসায়নিক প্রতীক। যেমন ইউরেনিয়ামের তিনটি আইসোটোপ হয়। ইউরেনিয়াম ২৩৪, ইউরেনিয়াম ২৩৫ এবং ইউরেনিয়াম ২৩৮। কিন্তু ইউরেনিয়ামের এই তিনটি আইসোটোপেই প্রোটনের সংখ্যা ৯২ হবার দরুন তিন ধরণের ইউরেনিয়ামের পরমাণু অঙ্ক ৯২। বিষয়টিকে আরও বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করার জন্য 234U, 235U এবং 238U ব্যবহৃত হয়। মূলত: ইউরেনিয়ামের রাসায়নিক প্রতীক U; কিন্তু তার তিনটি আইসোটোপকে এত সহজভাবে পরিচিত করবার আর অন্য কোন পদ্ধতি নেই। আসলে আইসোটোপকে নামাঙ্কিত করার একটি নির্দ্দিস্ট সূত্র আছে সেটি হল,—

পরমাণু ভর
রাসায়নিক প্রতীক   যেমন, $^{২৩৮}_{৯২}U$
পরমাণু অঙ্ক

এই পদ্ধতিটি মেনে চলেই এই তিনভাবে ইউরেনিয়ামের তিনটি আইসোটোপকে বিশেষায়িত করা হয়েছে।

এতক্ষণ পরমাণুর গঠন, আইসোটোপ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক-ভাবে করা হল না। পরমানবিক বা নিউক্লিয়ার শক্তির অনুধাবনে বিষয়গুলি অত্যন্ত প্রয়োজন। পরমাণুর শক্তির ব্যবহারিক দিকটিতে যাবার আগে এক নজরে পরমানবিক শক্তির প্রধান উৎস যা প্রকৃতিতে পাওয়া যায় সেই ইউরেনিয়াম সম্পর্কে একটু খোঁজ খবর নিয়ে নেওয়া যাক।

ইউরেনিয়াম একটি ধাতব পদার্থ। মার্টিন হাইনরিখ্ ক্লাপ্রথ ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইউরেনিয়াম আবিষ্কার করেন। ইউরেনিয়াম আকরিকের নাম ইউর‍্যানিনাইট বা পিচ্ব্লেণ্ড। ইউরেনিয়াম ছাড়া ইউরেনিয়াম আকরিকে সামান্য পরিমাণ থোরিয়াম পারকোনিয়াম, হিলিয়াম, আর্গন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি থাকে। তাছাড়া টরবার-নাইট, অটুনাইট প্রভৃতি আকরিকের মধ্যেও কিছু পরিমাণ ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর আগে ইউরেনিয়ামের প্রধান ব্যবহার ছিল রেডিয়াম ধাতুর মৌল হিসাবে। কারণ, ইউরেনিয়াম যেসব খনিজ পদার্থর প্রধান উপাদান তাতে সব সময়েই কিছুটা রেডিয়াম থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ইউরেনিয়াম থেকে রেডিয়াম নিষ্কাশনের পর যে ইউরেনিয়াম লবণ পড়ে থাকত তা ব্যবহৃত হত চিনামাটি অর্থাৎ পোর্সিলিন নির্মিত সামগ্রী রং করার প্রয়োজনে। তাছাড়া বিশেষ ধরণের ইস্পাত নির্মাণের জন্য লৌহ মিশ্রিত ইউরেনিয়াম (ফেরো-ইউরেনিয়াম) ব্যবহৃত হত।

আন্তর্জাতিক পারমানবিক শক্তি সংস্থা বা ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সির সমীক্ষা অনুযায়ী পৃথিবীতে ১৫ লক্ষ টন আহরণ যোগ্য ইউরেনিয়াম আছে।

১৮৯৬ খৃস্টাব্দে হেনরি বেকারেল কর্তৃক পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কৃত হবার পর মাত্র ৪৬ বছরের মধ্যে মানুষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক যুগান্তর এনেছে। এই কালজয়ী ঘটনাবলী সমাজ সভ্যতায় যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। তেজস্ক্রিয়তা, নিউক্লিয়াস এবং ইউরেনিয়াম এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একইভাবে সংযুক্ত। বেকা-রেলের আবিষ্কারের সাথে সাথে একদিকে চলছিল বিভিন্ন পদার্থর তেজস্ক্রিয়তা নির্ণয় অপরদিকে পাশাপাশি এসে গেল আইনস্টাইনের তত্ত্ব। এই দুটি ঘটনার প্রায়

একই সাথে আবিষ্কৃত হল নিউক্লিয়াস। আর অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এই তিনটি তত্ত্বকে একত্রিত করার প্রচেস্টায় বিজ্ঞানী মহলে ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। ১৯৪২-এর ২রা ডিসেম্বর ইতালিয়ান বিজ্ঞানী এন্‌রিকো ফের্মি (Enrico Fermi) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো শহরে তার ল্যাবরেটরীতে পারমানবিক শক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করলেন। মাত্র তিন বছরের মধ্যে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে ১৬ই জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকোতে পরীক্ষামূলকভাবে ফাটানো হল প্রথম পরমাণু বা অ্যাটম বোম। এই যে সমস্ত ব্যাপারগুলো ঘটল তার জন্য মূল অবদান ইউরেনিয়ামের। কারণ, ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তাকে নিউক্লিয়াস বিভাজনের কাজে লাগাতে গিয়ে জড় পদার্থে সঞ্চিত বিপুল শক্তি আহরণ করা যায়। এই শক্তিই পারমাণবিক শক্তি। এর পর পারমাণবিক শক্তি আহরণের প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক। পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি দুই উপায়ে সংগৃহীত হয়। প্রথম পদ্ধতির নাম ফিসন (FISSION) বা বিভাজন, দ্বিতীয় পদ্ধতি ফিউশন (FUSION) বা সংযোজন নামে পরিচিত। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে বহিরাগত অন্য নিউট্রন উপস্থিত হলে নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হয়। নিউক্লিয়াস এমন অবস্থায় যতক্ষণ না দুই ভাগে বিভক্ত হয়, ততক্ষণ নিউক্লিয়াসে স্থায়িত্ব ফিরে আসে না। নিউক্লিয়াস বিভাজনের সময় কিছু শক্তি উদ্ভূত হয়। এই শক্তিই হল পারমাণবিক শক্তি। নিউ-ক্লিয়াস বিভাজন করে অর্থাৎ নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে যে উপায়ে শক্তি আহরণ করা হয় তার নাম ফিশন্। দুটি নিউক্লিয়াস জুড়ে একটি নিউক্লিয়াস তৈরী করা যায় (নির্দ্দিস্ট অবস্থায় এ ঘটনা ঘটান যায়)। দুটি নিউক্লিয়াস একত্রিত হবার সময়ও কিছু শক্তির উদ্ভব হয়। এই শক্তিও পারমানবিক শক্তি। নিউক্লিয়াসের সংযোজনের মাধ্যমে যেভাবে শক্তি সংগৃহীত হয় তাকে বলে ফিউশন্। একটু বিস্তারিতভাবে বিষয়-গুলি দেখা যাক।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে লর্ড রাদারফোর্ড আলফা কণার আঘাতে নিউক্লিয়াস ভাঙ্গবার ব্যবস্থা করলেন। নিউক্লিয়াস ভাঙ্গতে গিয়ে তিনি বললেন যে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিউক্লিয়াসের বিভাজন প্রক্রিয়া যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে অতি ক্ষুদ্র পদার্থ-কণা থেকেও প্রচুর শক্তি সংগ্রহ সম্ভব। রাদার ফোর্ডের শক্তি পরীক্ষা (আলফা কণার আঘাতে নিউক্লিয়াস বিভাজন) ও তার ফল ঘোষণা আইনস্টাইনের বস্তু-শক্তির সম্পর্ক নির্ধারণ প্রভৃতির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকরা অনুপ্রাণিত হলেন। চতুর্দিকে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু হল। ইতিমধ্যে নিউট্রন আবিষ্কৃত হল। ইতালির

বৈজ্ঞানিক এনরিকো ফের্মি ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াস-এর মধ্যে নিউট্রনের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে নতুন মৌল তৈরীর কাজে প্রয়াসী হলেন। ফ্রান্সে জোলিও-কুরী দম্পতি (ফ্রেডারিক জোলিও এবং ইঁরে কুরী), জার্মানীতে অটোহান্ এবং ফ্রিৎস স্ট্র্যাস্ম্যান এ ধরণের গবেষণায় অগ্রগণ্য ছিলেন। ইউরেনিয়ামকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে ফল কি পাওয়া যাচ্ছে তা কিন্তু তাঁরা কেউই বুঝতে পারছিলেন না। ইউরেনিয়ামকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করার পর বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থগুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণে বিভিন্ন মৌল পাওয়া যাচ্ছিল। সুতরাং প্রত্যেকে কিঞ্চিৎ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। এইভাবে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা গেল ইউরেনিয়ামের সঙ্গে নিউট্রনের সংঘাতে যে নিউক্লিয় বিক্রিয়া হয় তাতে শুধুমাত্র বেরিয়ামই উৎপন্ন হয় না, ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে প্রায় সমান দু টুকরো হয়। এই ধরণের নিউক্লীয় বিক্রিয়ার নাম দেওয়া হল ফিসন্ বা বিভাজন। ব্যাপরটি কি রকম ?

একটি ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস-এর মধ্যে নতুন নিউট্রনের অনুপ্রবেশ ঘটান হল। নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্ব সঙ্গে সঙ্গে দূর হল। শেষ পর্যন্ত এই স্থায়িত্ব ফিরে আসে একমাত্র নিউক্লিয়াসের বিভাজনের মাধ্যমে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই দুটো টুকরোর ওজন যোগ করলে দেখা যায় তা মূল নিউক্লিয়াসের ওজন থেকে অনেক কম। তাহলে এই ঘাটতি ওজনটুকু গেল কোথায় ? উত্তর অত্যন্ত সহজ। ঐ ওজনটুকু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন একটা কাগজকে পোড়ালে পোড়া কাগজের ওজন কিঞ্চিৎ কমে যায় ঠিকই কিন্তু কাগজ পুড়াবার সময় যে গ্যাস উদ্ভূত হয় তার ওজন পোড়া কাগজের ওজনের সঙ্গে যোগ করলে যোগফল কাগজের ওজনের সমান হবে। ঠিক এই রকম ব্যাপার আর কি ! একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে বিভাজন ঘটলে ২০০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট বা ২০০ এম. ই. ভি শক্তি পাওয়া যায়। এক গ্রাম ইউরেনিয়ামে প্রায় ২৫০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০টি নিউক্লিয়াস পাওয়া যায়। যে কোন মৌলের পরমাণুতে যে কোন অবস্থায় বিভাজন ঘটান যায় না। $^{২৩৮}_{৯২}$ জাতীয় ইউরেনিয়াম এই কাজের জন্য আদর্শ। কারণ ভারী ইউরেনিয়ামে একটি বাড়তি নিউট্রনের আগমনেই নিউক্লিয়াসের মধ্যেকার এই বিপরীত ধরণের শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হয়।

নিউক্লিয়াসে বিভাজন প্রক্রিয়া ঘটবার সময় একটি বিচিত্র সমস্যা সৃষ্টি হয়। বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াস শুধুমাত্র দ্বিধা বিভক্তই হয় না, কয়েকটি নিউট্রনও থেকে ছিটকে যায়। এই ছিটকে যাওয়া নিউট্রনকে আবার ব্যবহার করা হয় অন্য

নিউক্লিয়াস বিভাজনের জন্য। এনরিকো ফের্মি তাঁর গবেষণা চালাবার সময় এই তথ্যটি আবিষ্কার করেন। তিনি কয়েকটি কৌশল কাজে লাগিয়ে নিউক্লিয়াস বিভাজনকে নিয়ন্ত্রিত করলেন। তিনি প্রমাণ করলেন যে বিভাজনের সময় ছিটকে আসা নিউট্রনগুলির সংখ্যা ও গতি যদি কমিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ২৩৫U অর্থাৎ ইউরেনিয়ামের একটি বিশেষ আইসোটোপের নিউক্লিয়াসের বিভাজন ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। একই আকারের অন্য পরমাণুর সঙ্গে নিউট্রনগুলির ধাক্কা লাগাতে পারলে পারস্পারিক সংঘর্ষে এদের ক্ষমতা ও গতি কিছুটা কমে যায়। দেখা গেল গ্রাফাইটকে এই কাজে লাগানো যেতে পারে। ফের্মি এমন একটা ব্যবস্থা করলেন যাতে এক স্তর ইউরেনিয়াম ও এক স্তর গ্রাফাইট পর পর সাজান থাকে। গ্রাফাইট ব্যবহারের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমতঃ দ্রুতবেগে বেরিয়ে আসা ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে নিউক্লিয়াসের বিভাজন হয়; আর ছিটকে বেরিয়ে আসা কিছু নিউট্রনের গতিবেগ গ্রাফাইট কমিয়ে দেয়। কিন্তু এই গতিবেগ এমন কিছু কমে না যাতে অন্য নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটানোর ক্ষমতা কমে যায়। দ্বিতীয়তঃ গ্রাফাইটের মধ্যে নিউট্রনের গতি অবারিত থাকে। ফের্মি ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে এইভাবে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস বিভাজন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে ক্রমাগত নিউক্লিয়াস বিভাজনের সময় দুটি নতুন মৌল তৈরী হয়—নেপচুনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম। এই দুটি মৌলেরও বিভাজন সম্ভব।

নিউক্লিয়াস বিভাজনের সময় যেমন শক্তির উদ্ভব হয় তেমনি নিউক্লিয়াস সংযোজনের সময়ও বেশ কিছু শক্তি পাওয়া যায়। এই শক্তি নির্গত হয় কেন ? দেখা যাক। তাপগতিবিদ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী যে কোন তাপমাত্রা ও চাপে গ্যাস থাকলে, গ্যাসের অনু-পরমাণুগুলি সব সময় গতিশীল হয়। অনু-পরমাণুগুলি একটি নির্দ্দিষ্ট বেগে চতুর্দ্দিকে ছুটে বেড়ায়। এই নির্দ্দিষ্ট বেগ বা গড় বেগ নির্ভর করে তাপমাত্রার উপর। কম তাপমাত্রায় বেগ কম হয়, বেশী তাপমাত্রায় বেগ বাড়ে। সাধারণ চাপ ও তাপমাত্রায় অনু-পরমাণুগুলির গড় শক্তি এক ইলেকট্রন-ভোল্টের কয়েক শতাংশ হয়। অথচ তাপের পরিমাণ যদি কয়েক লক্ষ ডিগ্রী সেলসিয়াস বাড়ান যায় তবে গড় শক্তি বেড়ে কয়েক এম.ই.ভি পর্যন্ত যায়। এহেন অবস্থায় একটি পরমাণুর সঙ্গে আরেকটি পরমাণুর সংঘাত সৃষ্টি করে নিউক্লিয় বিক্রিয়া সৃষ্টি করা যায়। পরমাণুগুলির শক্তি তাপের জন্য সৃষ্টি হয় বলে এই ধরণের বিক্রিয়াকে বলে থার্মো-নিউক্লিয়াস

রি-অ্যাকশন বা তাপ-নিউক্লিয়াস বিক্রিয়া। এই ধরণের বিক্রিয়ায় হাল্কা মৌলের পরমাণুগুলি একে অন্যের সঙ্গে জুড়ে যায়। দুটি নিউক্লিয়াস জুড়ে একটি নিউক্লিয়াস তৈরী হওয়ার এই পদ্ধতিকে বলে ফিউশন বা সংযোজন। সংযোজন বা ফিউশন পদ্ধতিতে বস্তু জুড়ে তার খানিকটা অবলুপ্ত হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

দশলক্ষ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন রাখলে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলির গতিবেগ এত বেড়ে যায় যে তাদের নিজেদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়। দুটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে সৃষ্ট একটি নতুন নিউক্লিয়াসের ভর মূল নিউক্লিয়াস দুটির ভরের যোগফলের চেয়ে কিছু কম হয়। বস্তুর এই কম অংশটুকু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

সূর্যসহ অন্যান্য তারায় এই প্রক্রিয়ায় শক্তির উদ্ভব হয়। সংযোজন প্রক্রিয়া সূর্য-তারার শক্তির উৎস হবার জন্য সূর্য বা তারা কখনও নিভে যায় না। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তারা জ্বলেই চলেছে। নিউক্লিয় সংযোজনের ফলে হাইড্রোজেন বদলে হয়ে যাচ্ছে হিলিয়াম এবং এই বিক্রিয়ায় যে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয় তার ফলে সংযোজনের ব্যাপ্তি বেড়ে যায়। অথচ এর ফলে অবলুপ্ত বস্তুর পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য।

পরমাণুর সংঘাতেই কিন্তু ফিউশন প্রক্রিয়া অর্থাৎ সংযোজন হয় না। সব পরমাণুতেই যেমন ফিউশন হয় না তেমনি সব অবস্থাতেই ফিউশন হয় না। বিশেষ অবস্থায় বিশেষ পরমাণুর সংঘাতেই নিউক্লিয় ফিউশন ঘটে। কম তাপমাত্রায় দুটি পরমাণুর মধ্যে সংঘর্ষ হলে পরমাণুগুলির শক্তি এত কম থাকে যে তাদের মধ্যে সংযোজনের সামর্থ থাকে না। সুতরাং সংযোজনের প্রাথমিক শর্ত হল প্রচণ্ড উত্তাপ।

সংযোজনের জন্য হাইড্রোজেন পরমাণুর ধর্মই হল শ্রেষ্ঠ। সাধারণ হাইড্রোজেন, ডয়টেরিয়াম বা ট্রাইটিয়াম হল সংযোজনের জন্য আদর্শ।

এখন দেখতে হবে পরমাণুর মধ্যে সঞ্চিত শক্তি কিভাবে ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুৎ শক্তি আহরণের মূল শর্ত টারবাইনের ঘূর্ণন। এ ব্যাপারে আগেই আলোচনা হয়েছে। (জল প্রবাহের সাহায্যে টারবাইন ঘুরানোর প্রসঙ্গও ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।) রাসায়নিক শক্তির ব্যবহারে অর্থাৎ কয়লা, গ্যাস, খনিজ তেলের সাহায্যে টারবাইন ঘুরানোর প্রক্রিয়া পরবর্তী পর্য্যায়ে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু

পারমাণবিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করলে অনেক বেশী শক্তি পাওয়া যায়। প্রায় ৫২৫ গ্রাম কয়লা থেকে ১ কিলো-ওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। আর ঐ একই পরিমাণ পারমাণবিক জ্বালানী থেকে ৮৩ হাজার কিলো-ওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এবার তাহলে নিউক্লিয়ার বিভাজনের পদ্ধতিতে কিভাবে পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যায় তা পর্যালোচনা করা যাক।

পরমাণু বিভাজনের জন্য যে বিশেষ যন্ত্র সাহায্য নেওয়া হয় তার নাম রি-অ্যাক্টর বা পারমাণবিক চুল্লী। রি-অ্যাক্টরের প্রধান কয়েকটি অংশর নাম, ১) মডারেটর; ২) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা কণ্ট্রোল; ৩) শীতল করার ব্যবস্থা বা কুলাণ্ট; ৪) প্রতিরোধক বা শিল্ড; ৫) প্রতিফলক বা রিফ্লেক্টর; ৬) নিউট্রন ডিটেক্টর। (সংশ্লিষ্ট ছবিটি দ্রষ্টব্য)
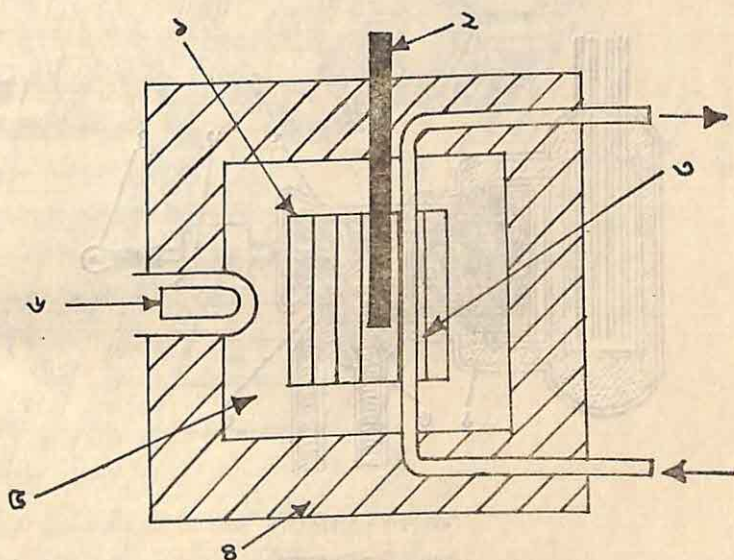
রি-অ্যাক্টর (প্রধান অংশসমূহ)

যে সব মৌলের পরমাণু বিভাজনে বেশী শক্তির উদ্ভব হয় তাদের ব্যবহার করা হয় পারমাণবিক চুল্লী বা রি-অ্যাক্টরের জ্বালানী হিসেবে। সাধারণতঃ ২৩৫U জাতীয় ইউরেনিয়াম এই কাজে ব্যবহৃত হয়। ইউরেনিয়াম চালিত রি-অ্যাক্টরে প্লুটো-নিয়াম সহজেই তৈরী করা যায়। প্লুটোনিয়াম উন্নত ধরনের রি-অ্যাক্টরে ব্যবহার

করা সম্ভব। রি-অ্যাক্টরে বিভাজনযোগ্য পরমাণু বিশিষ্ট মৌলের রড ব্যবহৃত হয়।

বিভাজন হলে কিছু নিউট্রন নির্গত হয়। বিভাজনের ফলে নির্গত নিউট্রনের বেগ প্রচণ্ড। বিভাজন প্রক্রিয়াকে ধারাবাহিক রূপ দিতে এই ধরণের বেরিয়ে আসা নিউট্রনকে কাজে লাগান যায়। ছিটকে বেরিয়ে আসা নিউট্রনের বেগ যাতে পরবর্তী বিভাজনে কাজে লাগে সেই কারণে এই বেগ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। নিউট্রনের গতিবিধি নির্দ্দিষ্ট করার প্রয়োজনে এমন কিছু জিনিষ ব্যবহার করতে যারা নিউট্রনের চলাফেরা নির্দ্দিষ্ট করে কিন্তু নিউট্রনকে গ্রাস করে না। গ্রাফাইট এবং জল এই কাজে প্রচণ্ড উপযোগী। রি-অ্যাক্টরের মডারেটর অংশে ছিটকে আসা নিউট্রনদের গতিবিধি সংযত করার ব্যবস্থা রাখা হয়। আর খুব স্বাভাবিকভাবেই এই কাজে গ্রাফাইট বা জল ব্যবহৃত হয়।
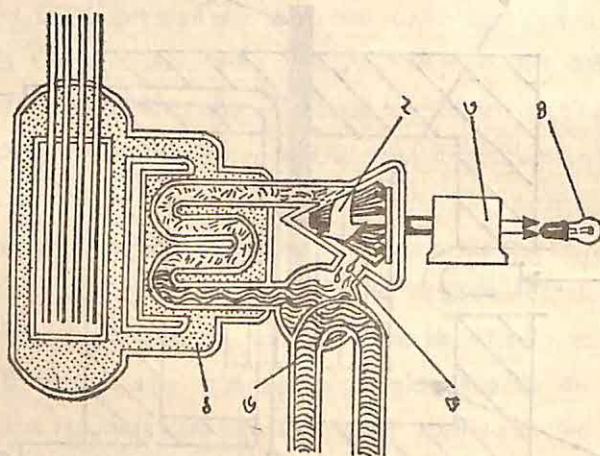
নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট

(সরল রৈখিক উপস্থাপনা)

১। জ্বালানীর দহন ও জলের বাষ্পে পরিবর্তন।
২। বাষ্পের তাপীয় শক্তির টারবাইন শ্যাফটের উপর ক্রিয়া।
৩। যান্ত্রিক শক্তির বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর।
৪। বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার।
৫। ব্যবহৃত বাষ্পের ঘনীভবন।
৬। জলের সাহায্যে ঘনীভূত বাষ্পের শীতলীকরণ।
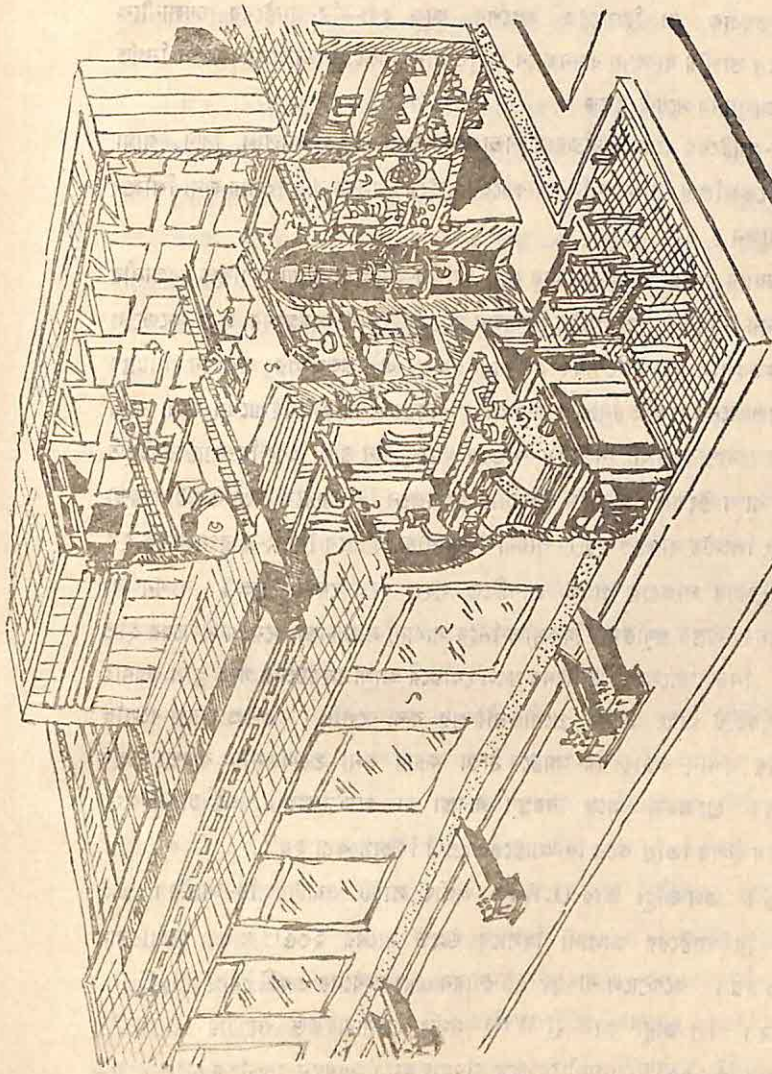
নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট

১। টারবাইন কক্ষ। ২। জেনারেটর। ৩। টারবাইন। ৪। রি-অ্যাক্টর কক্ষ। ৫। রি-অ্যাক্টর। ৬। জেনারেটর। ৭। গেট ভাল্ব। ৮। পাম্প। ৯। ক্রেন। ১০। জ্বালানী সরবরাহকারী অংশ। ১১। জ্বালানীর প্রজ্জ্বলন। ১২। শীতক।

প্রতিফলক বা রিফ্লেক্টের অংশের কাজ হল—রি-অ্যাক্টরের জ্বালানীকে সম্পূর্ণভাবে তাপীয় ব্যবস্থায় এমনভাবে আবৃত রাখা যাতে, বিভাজনের সময় নির্গত নিউট্রন জ্বালানীর মধ্যেই থাকে।

রি-অ্যাক্টরের মধ্যে নিউক্লিয়াস বিভাজনের সময় উদ্ভূত আলফা, বিটা, গামা ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় রশ্মিকে রি-অ্যাকটরের বাইরে আসতে না দেওয়ার জন্য শিল্ডিং এর প্রয়োজন।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা কণ্ট্রোলের কাজ হল রি-অ্যাক্টরের মধ্যে অবস্থিত জ্বালানীর বিভাজনের নিয়ন্ত্রণ। জ্বালানীর বিভাজন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কণ্ট্রোল অংশে কতকগুলি নিউট্রন-শোষক রড রাখা হয়। এই রডগুলির অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করে, বিভাজনের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বিভাজনের হার হিসাবের মধ্যে রাখা অর্থাৎ পারমাণবিক বা নিউক্লিয় শক্তিকে আয়ত্ত্বাধীন রাখা এবং রি-অ্যাক্টরে উদ্ভূত তাপকে বাষ্প উৎপাদনের কাজে লাগাবার প্রয়োজনে রি-অ্যাক্টরে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা বা কুলিং সিস্টেম ব্যবহৃত হয়। পারমাণবিক শক্তি কিভাবে বিদ্যুৎ-এ রূপান্তরিত হয় তা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যাণ্ট ছবিটিতে সহজ করে দেখান হল। ফিশন বা বিভাজনের বাস্তব প্রযুক্তিগত দিকগুলি নিয়ে সামান্য নাড়াচাড়া করে এ পর্যায়ের ইতি টানব। নিউক্লিয়াসের বিভাজনের ফলে বেরিয়ে আসা নিউট্রনের গতি হ্রাস করবার জন্য গ্রাফাইট এবং জলের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছি। তারও আগে বলেছি জ্বালানীর কথা ; এছাড়া রি-অ্যাক্টরে ঠাণ্ডা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজন আছে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা কণ্ট্রোলের। এই চারটি অংশ বিশেষের উপর ভিত্তি করে রি-অ্যাক্টরের শ্রেণী বিভাগ করা হয়।

১। এল ডাব্লু আর (LWR) অর্থাৎ লাইট ওয়াটার রি-অ্যাক্টর। এই ধরনের রি-অ্যাক্টরের জ্বালানী হিসাবে উন্নত মানের ২৩৫U অথবা প্লুটোরিয়াম ব্যবহৃত হয়। কণ্ট্রোলে ব্যবহৃত হয় বোরন এবং কার্বনের একটি যৌগ B_4C।

২। পি ডাব্লু আর (PWR) অর্থাৎ প্রেসারাইজড ওয়াটার রি-অ্যাক্টরে উন্নত মানের ২৩৫U জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এখানে অত্যধিক চাপে রক্ষিত জলকে মডারেটর এবং কুলাণ্টে ব্যবহার করা হয়। অন্য সব দিক থেকে এই রি-অ্যাক্টরের কার্যপ্রণালী এবং যন্ত্রাংশ এল ডাব্লু আর এর সমতুল।

৩। বি ডাব্লু আর (BWR) অর্থাৎ বয়েলিং ওয়াটার রি-অ্যাক্টর। উন্নত মানের ইউরেনিয়াম এই রি-অ্যাক্টরের জ্বালানী। আর কেবল গরম জল ছাড়া

অন্যান্য দিক থেকে এই রি-অ্যাক্টরের গঠন প্রণালী এবং কার্য পদ্ধতি এল ডাব্লু আর-এর সদৃশ।

৪। এইচ ডব্লু আর (HWR) অর্থাৎ হেভী ওয়াটার রি-অ্যাক্টর। এই রি-অ্যাক্টরে সাধারণ ইউরেনিয়াম জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যায়। তবে মডারেটর এবং কুলাণ্টে ভারী জল ব্যবহার করতে হয়। হাইড্রোজনের ভারী আইসোটোপের তৈরী ভারী জল বা হেভী ওয়াটার খুবই দুর্মূল্য এবং সংগ্রহর প্রক্রিয়াও জটিল। এই ধরণের রি-অ্যাক্টর পরিচালনার সুবিধা অনেক বেশী। কানাডায় প্রথম উদ্ভাবনের জন্য এই রি-অ্যাক্টরকে ক্যানাডিয়ান ডয়টেরিয়াম ইউরেনিয়াম বা সংক্ষেপে ক্যাণ্ডু (CANDU) রি-অ্যাক্টরও বলা হয়।

৫। এস জি এইচ ডব্ল্য আর (SGHWR) অর্থাৎ স্টীম জেনারেটিং হেভী ওয়াটার রি-অ্যাক্টর। এই রি-অ্যাক্টরের জ্বালানী উন্নত মানের ইউরেনিয়াম। এই রি-অ্যাক্টরের মডারেটরে ভারী জল এবং কুলাণ্ট-এ সাধারণ জল ব্যবহৃত হয়।

৬। এইচ টি জি আর (HTGR) অর্থাৎ হাই টেম্পারেচার গ্যাস কুল্ড রি-অ্যাক্টর। উন্নত মানের ইউরেনিয়াম, ২৩৩U এবং থোরিয়ামের ২৩৩Th আইসোটোপ এই রি-অ্যাক্টরের জ্বালানী। গ্রাফাইট ব্যবহৃত হয় এই রি-অ্যাক্টরের মডারেটরে আর এই রি-অ্যাক্টরের কুলাণ্ট-এ হিলিয়াম গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

৭। এল এম এফ বি আর (LMFBR) অর্থাৎ লিকুইড মেটাল ফাস্ট ব্রিডার রি-অ্যাক্টর। হাল্কা জল বা ভারী জল যে সব রি-অ্যাক্টরে ব্যবহৃত হয় সেখানে দুধরণের জলেরই মূল কাজ বিভাজনের ফলে মুক্ত নিউট্রনের গতিবেগ মন্দীভূত করা। এ কারণে এদের তাপীয় রি-অ্যাক্টর বলে। জ্বালানী পদার্থের সাধারণ তাপমাত্রায় স্বাভাবিক গতি মৃদু হয়। তাপীয় নিউট্রনের বেগও সেই কারণেই কম হয়; এই রি-অ্যাক্টরে রূপান্তরের অনুপাত অপেক্ষাকৃতভাবে কম। ব্রিডার রি-অ্যাক্টরের কাজ একই সাথে জ্বালানীর দহন এবং জ্বালানীর সৃষ্টি। থোরিয়াম নামক মৌলটির পারমাণবিক বিক্রিয়ায় ইউরেনিয়ামের ২৩৩U আইসোটোপ পাওয়া যায়। ২৩৩U আবার বিভাজনক্ষম। প্রকৃতিতে ইউরেনিয়ামের ২৩৮U আইসোটোপ পাওয়া যায়। একে সরাসরি রি-অ্যাক্টরের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। তবে ইউরেনিয়াম-এর একটি আইসোটোপ ২৩৫U কে জ্বালানীর কাজে লাগান যায়। ২৩৮U আইসোটোপের সাথে ৭ শতাংশ ২৩৫U পাওয়া যায়; জ্বালানীর জন্য প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম থেকে ২৩৫U আইসো-

টোপ সংগ্রহ করতে হয়। বিভাজনের পর দ্রুতগতি সম্পন্ন যে নিউট্রনগুলি নির্গত হয় তাদের আরও বিভাজনের কাজে লাগাবার জন্য মডারেটরের সাহায্যে গতিবেগ হ্রাস করা হয়। থার্মাল রি-অ্যাক্টরে প্রতি বিভাজনে ২.৫৪ নিউট্রন নির্গত হয়। এর মধ্যে পরবর্তী বিভাজনের জন্য একটি নিউট্রন রেখে দিতে হয়। অবশিষ্ট নিউট্রনটি দিয়ে নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় প্লুটোনিয়াম—এর ২৩৯ Pu আইসোটোপ পাওয়া যায়; কিন্তু থার্মাল রি-অ্যাক্টরে এর পরিমাণ বেশী হয় না। কিন্তু দ্রুতগতি সম্পন্ন নিউট্রন দিয়ে বিভাজন করলে প্রতি বিভাজনে চার অথবা পাঁচটি নিউট্রন নির্গত হয়। পরবর্তী বিভাজনের জন্য একটি নিউট্রন রেখে দিলেও বাকী নিউট্রনগুলির মধ্যে কয়েকটি ব্রিডারের জন্য পাওয়া সম্ভব। দ্রুতবেগ সম্পন্ন নিউট্রন ব্যবহার করা হয় বলে এদের ফাস্ট রি-অ্যাক্টর বলে। এই ধরণের রি-অ্যাক্টরে মডারেটর থাকে না তাই নিউট্রনের শোষণ কম। ব্রিডার রি-অ্যাক্টর মূলতঃ ফাস্ট রি-অ্যাক্টর। ইউরেনিয়াম থেকে ২৩৫U আইসোটোপ আলাদা করার পদ্ধতি জটিল এবং ব্যয়সাপেক্ষ। ঠিক মত নক্সা করতে পারলে ফাস্ট ব্রিডার রি-অ্যাক্টরে অনেক কম খরচে পরমাণু জ্বালানী তৈরী সম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে। এল এম এফ বি আর-এর কুলাণ্ট-এ ব্যবহৃত হয় তরল সোডিয়াম।

৮। এল ডাব্লু বি আর (LWBR) অর্থাৎ লাইট ওয়াটার ব্রিডার রি-অ্যাক্টর। ইউরেনিয়ামের ২৩৩U এবং থোরিয়ামের ২৩২Th আইসোটোপ এই রি-অ্যাক্টরের জ্বালানী। এই রি-অ্যাক্টরে জল মডারেটর এবং কুলাণ্ট উভয় জায়গাতেই ব্যবহৃত হয়।

৯। জি সি এফ বি আর (GCFBR) অর্থাৎ গ্যাস কুল্ড ফাস্ট ব্রিডার রি-অ্যাক্টর। প্লুটোনিয়াম এবং ২৩৮U আইসোটোপ এই রি-অ্যাক্টরের জ্বালানী। এই ধরণের রি-অ্যাক্টরে মডারেটর থাকে না। আর কুলাণ্ট-এ ব্যবহৃত হয় হিলিয়াম গ্যাস।

১০। এম এস বি আর (MSBR) অর্থাৎ মোল্টেন সল্ট ব্রিডার রি-অ্যাক্টর। এই ধরণের রি-অ্যাক্টরের জ্বালানী ২৩৩U আইসোটোপের ফ্লোরাইড অথবা ২৩২Th আইসোটোপ। মডারেটরে ব্যবহৃত হয় গ্রাফাইট আর কুলাণ্ট-এ ব্যবহৃত হয় গলিত লবণ।

ফিশন পদ্ধতিতে নিউক্লিয়ার শক্তি বা পারমাণবিক শক্তি আহরণের বহু সুবিধা জনক দিক আছে। যেমন—

১। অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন।

২। স্বল্প জ্বালানী ব্যয়ে বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন।

৩। পৃথিবীতে পারমাণবিক জ্বালানীর সঞ্চয় যথেষ্ট হলেও. ফাস্ট ব্রিডার রি-অ্যাক্টরের সহায়তায় এই জ্বালানীকে বারে বারে ব্যবহার যোগ্য করা যায়।

৪। অন্যান্য শক্তি উৎস ফুরিয়ে এলেও পারমাণবিক শক্তির উৎস নিঃশেষিত হবার সম্ভবনা কম।

পাশাপাশি এই পদ্ধতির কিছু খারাপ দিকও আছে। যেমন—

১। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাপনে সময় বেশী লাগে।

২। জ্বালানীকে ব্যবহারোপযোগী করে তোলা ব্যয় সাপেক্ষ।

৩। বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদ্ধতি জটিল, অতিরিক্ত সতর্কতা এবং ব্যয় সাপেক্ষ।

৪। অত্যন্ত উচ্চস্তরের রক্ষণাবেক্ষণ দরকার।

৫। যান্ত্রিক ত্রুটির ফলে দ্রুত পরিবেশ দূষণ হয়। দূষিত পরিবেশ কর্মচারীদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

পারমাণবিক রি-অ্যাক্টর ও কয়লা থেকে তাপ বিদ্যুৎ আহরণের ক্ষেত্রে কর্মীর মৃত্যুর হার প্রায় সমান। স্বাস্থ্যের পক্ষেও সমান ক্ষতিকর। বরং কয়লা খনির কাজে এবং কয়লা পরিবহনে মৃত্যুর হার বেশী। কয়লাখনি এলাকায় আবহাওয়া সাধারণ অবস্থায় অনেক বেশী দূষিত হয়। কিন্তু রি-অ্যাক্টরে দুর্ঘটনা ঘটলে যে সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হয় কয়লাখনিতে সেরকম দুর্ঘটনাই ঘটে না। প্লুটো-নিয়াম রি-অ্যাক্টরের সর্বশেষ আবর্জনাও এত তেজস্ক্রিয় যে তা পৃথিবীর কোথায় ফেলা হবে তা এক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

নিউক্লিয়াসের বিভাজনের মাধ্যমে যতই বিদ্যুৎ আহরণের সুযোগ বাড়ুক না কেন তাকে যে কোন মুহূর্তেই পৃথিবী ধ্বংসের কাজে লাগানো যেতে পারে। নিউ-ক্লিয়ার শক্তি বা পারমাণবিক শক্তির খারাপ দিকগুলি তীব্র ক্ষতিকারক হওয়া সত্ত্বেও আগামী দিনগুলিতে এর ব্যবহার যে বাড়বেই এ বিষয়ে কোন কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

নিউক্লিয়াসের বিভাজনের জন্য প্রয়োজন ভারী মৌল, অর্থাৎ বেশী পরমাণুভর বিশিষ্ট পরমাণু। পরমাণুর সংযোজনের জন্য প্রয়োজন হালকা নিউক্লিয়াস অর্থাৎ কম পরমাণু ভর বিশিষ্ট পরমাণু। হাইড্রোজেনের দুটি আইসোটোপ ডয়টেরিয়াম এবং ট্রাইটিয়াম খুব উচ্চ তাপমাত্রায় সংযোজিত হলে হিলিয়াম সৃষ্টি হয়। একই

সঙ্গে অত্যন্ত শক্তিশালী কিছু নিউট্রন উদ্ভূত হয়। অবিরাম নিউক্লিয়াসের সংযোজন হল সূর্যের অফুরন্ত শক্তি উৎপাদনের মূল কথা। হাইড্রোজেন বোমেও একই প্রক্রিয়া ঘটে। আবার একই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎও পাওয়া যায়। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের ১লা নভেম্বর নব আবিষ্কৃত হাইড্রোজেন বোম প্রশান্ত মহাসাগরের এলুজেলাব নামক ১৩ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট এক প্রবাল দ্বীপে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহৃত হয়। যার ফলে দ্বীপটি ভূপৃষ্ঠ থেকে অন্তর্হিত হয় ; বলা যায় সেদিনই মানুষ প্রথম নিউক্লিয়াসের সংযোজন প্রক্রিয়া সার্থকভাবে করায়ত্ব করল। তবে নিউক্লিয়াসের সংযোজন বা ফিউশনের মাধ্যমে শক্তি আহরণ প্রক্রিয়া এখনও গবেষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

দুটি পদ্ধতিতে নিউক্লিয়াসের সংযোজন বা ফিউশনের প্রচেষ্টা চলছে। প্রথম পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন আইসোটেপের যৌগের টুকরো অত্যন্ত স্বল্প সময়ে এক হাজার থেকে দশ হাজার গুণ চাপে পিষ্ট করা হয়। এরকম প্রচণ্ড চাপে পিষ্ট করার জন্য ইলেকট্রন রশ্মি, আয়ন রশ্মি কিংবা লেজার বিকিরণের সহায়তা নেওয়া হয়। আপতিত রশ্মির শক্তিতে টুকরোগুলির বাইরের স্তর বাষ্পীভূত হয়ে সরে আসার সময় প্রচণ্ড এক শক্ (shock), তরঙ্গ টুকরোগুলিকে বেশী ঘনত্বে ঘনীভূত করে। ফলে অত্যন্ত শক্তিশালী নিউট্রন নির্গত হয়। এই সব শক্তিশালী নিউট্রন যদি তরল লিথিয়ামের আবরণে শোষণ করান যায় তবে যে তাপ সৃষ্টি হয়, সেই তাপে জলীয় বাষ্প তৈরী হয় এবং এই জলীয় বাষ্প ব্যবহার করে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। একই সাথে নিউট্রনের আঘাতে লিথিয়াম, ট্রাইটিয়ামে পরিণত হয়। সুতরাং ফিউশনের জন্য প্রয়োজনীয় পরমাণুরও অভাব হওয়া উচিত নয়। নিউক্লিয়াসের সংযোজন প্রক্রিয়ায় ডয়টেরিয়াম ও ট্রাইটিয়াম আয়ন-এর শক্তি প্রায় ৫০ কিলোভোল্ট আর নির্গত নিউট্রনে প্রায় ১৫ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি থাকে। কিন্তু এই ৩০০ গুণ শক্তি কখনই বাস্তবে পাওয়া যায় না। কারণ তাপ-শক্তির বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হবার সময় যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সংঘাতে এবং সংশ্লিষ্ট প্লাজমার ইলেকট্রনের আঘাতে এই শক্তির অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন আইসোটোপকে প্লাজমা অবস্থায় উচ্চ তাপ মাত্রার চুম্বকীয় আধারে রেখে নিউক্লিয়াসের সংযোজন বা ফিউশন ঘটানো হয়।

কঠিন, তরল, গ্যাসীয় পদার্থের এই তিনটি ভৌত অবস্থা ছাড়াও প্লাজমা নামক একটি অবস্থায় পদার্থ থাকতে পারে। ১০ লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পদার্থর গ্যাসীয় অবস্থা দূর হয়। এই অবস্থায় পদার্থর হালচাল একদম পাল্টিয়ে

যায়। সাধারণ অবস্থায় ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে নিউক্লিয়াসের আকর্ষণেই ঘোরে। ফলে পরমাণু ভেঙ্গে যায় না। আবার ইলেকট্রনের সমান আধান ও ভর বিশিষ্ট প্রোটনের অবস্থান পরমাণুকে আধান শূন্য করে। কিন্তু অতিরিক্ত তাপে নিউক্লিয়াসের আকর্ষণী শক্তির চেয়ে ইলেকট্রনের গতিবেগ বেশী হয়। ফলে ইলেকট্রনগুলি এলোমেলোভাবে ঘুরতে থাকে। এই অবস্থাকে বলে প্লাজমা। প্লাজমায় থাকে আয়ন আর প্রচণ্ড গতিবেগ সম্পন্ন এবং কোন নির্দ্দিষ্ট অভিমুখ বিহীন প্রায় সমান সংখ্যক ইলেকট্রন। ৫০ কিলোভোল্ট আর ১৫ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা প্রায় সমান। এত উচ্চ তাপমাত্রার পরমাণু কণা আধারের সংস্পর্শে আসতে না দিয়ে কোন চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। অথচ কোন ধাতব পদার্থই এরকম উচ্চতাপ সহনশীল নয়। সুতরাং সমস্যা। সমস্যার শেষ এখানেই নয়। আরো আছে। চৌম্বক ক্ষেত্রে আবদ্ধ করার ক্ষেত্রেও সমস্যা আছে। প্লাজমার গতিবেগে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। চৌম্বক-ক্ষেত্র যে আধারে রক্ষিত হয় সেখানে এতটুকু ছিদ্র হলে প্লাজমা বেরিয়ে যায়। আবার চৌম্বক ক্ষেত্র উৎপাদনের জন্য বিপুল শক্তিরও প্রয়োজন সব মিলিয়ে এই পদ্ধতি এখনও সমস্যা সংকুল।

সংযোজন বা ফিউশনের জন্য প্রায় ১০০ সেকেণ্ড বা বেশী সময়ের জন্য প্রতি ঘন মিটারে প্রায় ১০১২টি কণা থাকা দরকার। এজন্য অত্যন্ত শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োজন, (প্রায় ৬ হাজার গউস চৌম্বক ক্ষেত্র দরকার) ; বর্তমানে যে যন্ত্র দিয়ে নিউক্লিয়াসের সংযোজন সম্পন্ন করা হয় তার চৌম্বক ক্ষেত্রের ব্যাস ৩৫ মিটার এবং উচ্চতা ২৫ মিটার। এই ধরণের চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী চুম্বকের ধারণা অতীতে করা সম্ভব ছিল না। অতি পরিবাহী ধাতব তার দিয়ে এই চুম্বক তৈরি করা হয়। অন্যথায় চৌম্বক শক্তিতে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমাণ, প্রাপ্ত চৌম্বক শক্তির চেয়ে অনেক বেশী হয়ে যায়। আবার অতি পরিবাহী ধাতব পদার্থের ব্যবহার চুম্বক তৈরির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি করে। এই ধরণের যন্ত্রকে টেকোম্যাক শ্রেণীর যন্ত্র বলে আখ্যা দেওয়া হয়। টেকোম্যাক শ্রেণীর যন্ত্র ছাড়া অন্য যেসব যন্ত্রাদি নিউক্লিয়াসের সংযোজনের জন্য ব্যবহৃত হয় সেগুলি টেকোম্যাকের মত কার্য্য-ক্ষমতা সম্পন্ন নয়। আশা করা হচ্ছে যে টেকোম্যাকের জটিল সমস্যার খুব শীগগীরই সমাধান করা যাবে। তবে বাণিজ্যকভাবে নিউক্লিয়াসের সংযোজন প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ শক্তি আহরণের সম্ভাবনা এখনও সুদূর পরাহত।

বর্তমানে নিউক্লিয়াসের বিভাজন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় রি-অ্যাক্টরের দাম নিউক্লিয়াস সংযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় টেকোম্যাকের চেয়ে কম। প্রযুক্তিবিদ্যাগত গঠন প্রণালীর দিক থেকে টেকোম্যাক অনেক বেশী জটিল। সংযোজন প্রক্রিয়ায় নির্গত নিউট্রন অনেক বেশী শক্তিশালী। অতএব সংযোজনের সময় নির্গত নিউট্রনের ক্ষতিকারক ক্ষমতাও বেশী। সুতরাং আবরণের দৃঢ়তা অনেক বেশী হওয়া দরকার। সুতরাং খরচের বহর হবে বেশী। তবে আশার কথা রি-অ্যাক্টরের মত দীর্ঘস্থায়ী তেজষ্ক্রিয় পদার্থ থেকে পরিবেশ দূষণের অসুবিধা নিউক্লিয়াসের সংযোজনে সৃষ্টি হয় না। নিউক্লিয়াসের সংযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী ডয়টেরিয়াম জল থেকে সব সময়ই পাওয়া যাবে। অতএব জ্বালানী নিঃশেষ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তবে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থ যেমন লিথিয়াম, বেরিলিয়াম প্রভৃতি অত সহজে পাওয়াও যায় না এবং তাদের যোগানও অফুরান নয়।

পারমাণবিক শক্তি আহরণের সমস্যা অনেক। পারমাণবিক শক্তি সংগ্রহর সাথে পরিবেশ দূষণের মত সাংঘাতিক ক্ষতিকর দিকও জড়িত। আবার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহার আরও ক্ষতিকারক। তবু যেভাবে মানুষের শক্তির চাহিদা বাড়ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে মানবসভ্যতা পারমাণবিক শক্তির (তা সে পরমাণু বা নিউক্লিয়াস বিভাজন বা ফিশন প্রক্রিয়ায় রি-অ্যাক্টর বা ফাস্ট ব্রিডার-এর মাধ্যমেই হোক কিংবা পরমাণু বা নিউক্লিয়াস সংযোজন বা ফিউশন প্রক্রিয়ায় টেকোম্যাক বা অন্য কোন যন্ত্রর মাধ্যমেই হোক না কেন) উপর আরও অনেক বেশী বেশী করে নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ পরমাণুকেই আগামী দিনের অন্যতম শক্তি উৎস হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন।

সাত

সৌরশক্তি

সূর্যের সঙ্গে মানুষের অনেক কালের পরিচয়। সূর্যরশ্মি মানুষের জীবনে এক পরম সম্পদরূপে সভ্যতার সেই শুরুর দিন থেকেই স্বীকৃত। যখন প্রখর সূর্যতাপে জীব জগৎ মরণাপন্ন হয়ে ওঠে তখনও কিন্তু সূর্যকে মিত্ররূপেই দেখা হয়েছে। ভয়ে, শ্রদ্ধায় বারেবারেই সূর্যর কাছে মানুষ মাথা নীচু করেছে ; করেছে তার স্তুতি-বন্দনা, সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছে আকাশের ঐ জলজলে নক্ষত্রটিকে। যদিও সূর্যর গঠন প্রণালী, তার শক্তির কারণ প্রভৃতি অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে তবুও সূর্যর শক্তিকে মানুষ আপন প্রয়োজনে দীর্ঘকাল ধরেই ব্যবহার করে চলেছে। যতদিন গেছে ততই বেড়েছে সূর্যরশ্মি ব্যবহারের ব্যাপ্তি। নিয়মিত এবং ক্রমাগত নিউক্লিয়াসের সংযোজনেই সূর্যে এত বিপুল শক্তির সৃষ্টি। নিউক্লিয়াসের সংযোজনে উদ্ভূত এই শক্তি পৃথিবীতে আলো, অদৃশ্য রশ্মি এবং তাপের আকারে অনুভূত হয়। পার্থিব জীবনের উৎস সূর্যশক্তি। সূর্য সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান যখন যে পর্যায়ে গেছে তখন সূর্যর বিপুল শক্তির ততটুকুই মানুষ ব্যবহার করতে শিখেছে। সূর্য রশ্মির উপর মানুষ তথা পৃথিবীর প্রাণী জগৎ এত নির্ভরশীল অথচ সূর্য থেকে তার চার পাশে যে শক্তি ছড়িয়ে যায় তার ২ হাজার লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ সূর্য থেকে ছড়িয়ে পড়া শক্তি ব্যবহার করে মোট ২ হাজার লক্ষ পৃথিবী বেঁচে থাকতে পারে। বৈদ্যুতিক শক্তির সঙ্গে তুলনা করলে পৃথিবীতে আসা সূর্যশক্তির পরিমাণ হল ১৮০×১০^{১৮} কিলোওয়াট অর্থাৎ ১৮০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ কিলোওয়াট। পৃথিবীর প্রতি বর্গমিটার আয়তনে যে পরিমাণ সূর্যশক্তি নিয়ত পতিত হয় তার পরিমাণ ১.৩৬ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-এর সমান। সূর্যর শক্তি বা সৌরশক্তির সবটুকুই যদি ব্যবহারের সুযোগ থাকত তাহলে পৃথিবীতে শক্তি নিয়ে এত চিন্তার কারণ থাকত না। শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পৃথিবীর পয়লা নম্বর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশেরও সারা বছরের শক্তির চাহিদা সে দেশে মাত্র ৩২ মিনিটে যেটুকু সূর্যর রশ্মি পড়ে তা থেকে মেটানো যেত। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয় না। কারণ ত্রিবিধ। প্রথমতঃ আবহমণ্ডলে

সৌরশক্তির অধিকাংশই শোষিত হয়। দ্বিতীয়তঃ সৌর শক্তিকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার উপকরণের অভাব। তৃতীয়তঃ পৃথিবীতে আগত সমস্ত সূর্যরশ্মি সংগ্রহ করাও অসম্ভব। সাধারণভাবে সৌরশক্তি থেকে তাপ বা আলোকশক্তি সরাসরি পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু তাদের অন্য ধরণের কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহারের সুযোগ কম। অর্থাৎ সূর্য শক্তিকে অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব। উপকরণের অভাব মানে এই নয় যে বাজারে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নেই। আসলে সূর্য রশ্মি পৃথিবীতে নিয়মিত পাওয়া যায় না। বিভিন্ন কারণে তার আগমন অনিয়মিত। আকাশে মেঘ থাকলে তো সূর্যর দেখা পাওয়াই মুস্কিল। আবার বছরের সব সময় তো বটেই দিনের সব সময়ও সূর্যর তেজ সমান থাকে না। আবার রাত্রে সূর্য অনুপস্থিত। এই সব অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে সমস্ত সৌরশক্তি সংগ্রহর মত উপকরণই এখনও উদ্ভাবিত হয়নি। সুতরাং অভাব উপকরণের। পৃথিবীতে মানুষ আবির্ভাবের সাথে সাথেই, সৌরশক্তির ব্যবহারে অভ্যস্ত। সরাসরি সৌর শক্তির ব্যবহারেও তাই কোন বাধ্যবাধকতা নেই। উদ্ভিদ জগতে আলোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার প্রচলন আছে। গাছের পাতা সূর্যালোক কাজে লাগিয়ে গাছের খাদ্য প্রস্তুত করে এবং উদ্ভিদ জগতে সৌরশক্তি সঞ্চিত হয়। অনুমান করা হয় সংগৃহীত শক্তির মাত্র ৫ শতাংশ সৌর শক্তি উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় জালানীতে রূপান্তরিত হয়। তবে সাধারণতঃ যে সব উদ্ভিদ জালানীরূপে ব্যবহৃত হয় তাদের ক্ষেত্রে এই রূপান্তর ক্ষমতামাত্র ০.৫ শতাংশ থেকে ১ শতাংশ। উদ্ভিদ-জাত জালানী থেকে পরোক্ষ উপায়ে সৌরশক্তি ব্যবহৃত হয়। আবার এধরণের জালানী থেকে প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ কয়লার চেয়ে কম। অর্থাৎ একই ওজনের কয়লা থেকে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় সমপরিমাণ উদ্ভিদজাত জালানী থেকে তার ২ শতাংশ শক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু মজা হল উদ্ভিদ উৎপাদন সংরক্ষণ প্রভৃতি প্রক্রিয়া যথেষ্ট ব্যয় বহুল। যেমন গাছপালা বেড়ে ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে হয়; আবার জমিরও প্রয়োজন। অতএব প্রয়োজনীয় সময় এবং জমি থেকে এমন এক শক্তি উৎস পাওয়া যায়, যার কার্যক্ষমতা খুবই কম। সুতরাং এভাবে পরোক্ষ উপায়ে সৌর শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও প্রচেষ্টা ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে। তবে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে জালানী হিসাবে অর্থাৎ শক্তির উৎস হিসেবে গাছপালার ব্যবহার এখনও যথেষ্ট। সৌরশক্তির আরও একরকম অপ্রত্যক্ষ ব্যবহার আছে। আলোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় জলাজমির নীচে অবস্থিত

কাদায় বায়ুহীন অবস্থায় রক্ষিত জৈব পদার্থ ক্ষয় পেয়ে মিথেন গ্যাস তৈরী হয়। আবর্জনা, জঞ্জাল, গোবরসহ অন্যান্য প্রাণীর বিষ্ঠা প্রভৃতি থেকে কৃত্রিম উপায়ে এরকম গ্যাস উৎপাদন সম্ভব। তবে এধরণের পদ্ধতিতে প্রাপ্ত গ্যাসের উৎস-ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট, বায়ো-গ্যাস প্ল্যান্ট প্রভৃতি যন্ত্র মাধ্যমে এ ধরণের গ্যাস কিছু কিছু তৈরী করা হচ্ছে।

৫০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বায়ুহীন প্রকোষ্ঠে জৈব পদার্থ গরম করে তেল বা গ্যাস তৈরী করা যায়। যে প্রক্রিয়ায় এই ঘটনাটি ঘটান হয় তার নাম পাই-রোলিসিস্। এই পাইরোলিসিস পদ্ধতিতে আবর্জনা থেকে ৮৫ শতাংশ ব্যবহার যোগ্য জ্বালানী তৈরী সম্ভব। কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থাটির এখনও যথেষ্ট উন্নতির প্রয়োজন। জৈব রূপান্তর বা বায়োকনভারশন প্রক্রিয়ায় পরোক্ষভাবে সৌরশক্তি ব্যবহারের সুযোগ থাকলেও এবিষয়ে সামগ্রিকভাবে এখনও যথেষ্ট গবেষণার সুযোগ আছে এবং প্রচেষ্টাও চলছে।

সৌর শক্তির মাধ্যমে ফসল সংরক্ষণ দীর্ঘদিন থেকে প্রচলিত। যেসব অঞ্চলে প্রখর সূর্যালোক পাওয়া যায় সেইসব স্থান ছাড়াও কমবেশী এই পদ্ধতিতে পৃথিবীর সর্বত্র সূর্য রশ্মির তাপে ফসলের আদ্রতা দূর করা হয়। ফসলের সংরক্ষণের জন্য আদ্রতা অপসারণ একান্ত অপরিহার্য। সাধারণভাবে এক টুকরো শুকনো জমির উপর ফসল ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সূর্যতাপে ফসলের আদ্রতা দূর হয় এবং ফসল সংরক্ষণযোগ্য হয়। তবে ইদানীং সোলার ড্রায়ার বা সৌরশক্তির সাহায্যে শুষ্ক করার প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি বলতে কিন্তু অন্য একটি বিশেষ পদ্ধতিকে বোঝানো হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে কৃষিজাত সামগ্রীকে সরাসরি সূর্যালোকের সংস্পর্শে আনা হয় না। একটি আবদ্ধ প্রকোষ্ঠে কৃষিজাত সামগ্রী রাখা হয়। এই প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়ে সূর্যালোকে উত্তপ্ত হাওয়া চালনা করা হয়। এতে এক দিকে যেমন ফসল সংরক্ষণযোগ্য হয় পাশাপাশি ঐ ফসল মাটিতে ঢেলে শুকোবার সময় বৃষ্টি, পোকামাকড়, পাখী প্রভৃতি কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার সুযোগ কম পায়। কোন নির্দিষ্ট যন্ত্র এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় না। তবে গত ২৫ বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্থানীয় উপকরণ (Indegenous Material), প্রচলিত প্রযুক্তি বিদ্যার (Traditional Technology) সাহায্যে সোলার ড্রায়ারকে উন্নত করার চেষ্টা চলছে এবং বিভিন্ন দেশে এর প্রচলন বাড়ছে।

অনেককাল ধরেই এই পদ্ধতিতে সূর্যালোক ব্যবহার করে নুন প্রস্তুত করা হয়।

সাগর অথবা নোনাজল যেখানে পাওয়া যায় তার পাশে অগভীর ছোট পুকুর বা গর্ত কেটে সেখানে নোনাজল জমিয়ে রাখা হয়। তারপর জলের অংশ হাওয়া এবং সূর্যালোকে বাষ্পীভূত হয় এবং লবণের কেলাস পুকুর বা গর্ত'র তলায় সঞ্চিত হয়। বহু পুরনো এ পদ্ধতি আজও বহুল ব্যবহৃত।

সরাসরি সৌরশক্তির ব্যবহার ইদানীংকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে শীত প্রধান দেশে, যেখানে গরম জল একান্ত অপরিহার্য। সে সব জায়গায় সস্তায় জল গরম করার জন্য সৌর শক্তির ব্যাপক ব্যবহার চালু হয়ে গেছে। সৌরশক্তির সাহায্যে জল গরম করার পদ্ধতিতে তেমন কোন জটিল যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন নেই। একটি জলাধারে জল থাকে। আর প্রয়োজন একটি চ্যাপ্টা আকারের সংগ্রাহক (Flat plate collector)। সংগ্রাহকের উপর সূর্যকিরণ এসে পড়ে। সংগ্রাহকটি সাধারণতঃ তাপ শোষণকারী ধাতু দিয়ে তৈরী হয়। উপরন্তু সংগ্রাহকের অপর পৃষ্ঠ তাপ-অপরিবাহী পদার্থ দিয়ে মোড়া থাকে। ফলে সঞ্চিত তাপের বিকিরণ হয় না। জলাধার এবং সংগ্রাহক এমনভাবে নলের সাহায্যে সংযুক্ত হয় যাতে জলাধার থেকে, আপনা থেকেই জল সংগ্রাহকের দিকে যায়। আর জলের চাপেই সেই জল আবার জলাধারে ফিরে আসতে পারে।, সংশ্লিষ্ট ছবিটি দেখলে ব্যাপারটি পরিষ্কার বোঝা যাবে; এই রৈখিক ছবিটি দিয়ে সাধারণ সোলার ওয়াটার হিটার বা সৌরশক্তির সাহায্যে জল গরম করার পদ্ধতিটি দেখান হয়েছে।
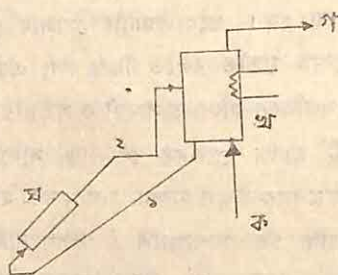
সোলার ওয়াটার হিটার দ্বারা জল গরম করার পদ্ধতি।

(ক) শীতল জলের সরবরাহ

(খ) অক্সিলারি

(গ) গরম জল প্রবাহ

(ঘ) সংগ্রাহক

জল জলাধারে থাকে। এবং জলাধার থেকে ১নং নল দিয়ে সংগ্রাহকের মধ্যে চলে যায়। সংগ্রাহক সৌরশক্তি সংগ্রহ করে। সংগ্রাহকের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় জল গরম হয় এবং গরম জল ২নং নল দিয়ে জলাধারে ফিরে আসে। ১নং নলের জলে চাপ থাকায় গরম জল উপর দিকে চলে আসতে বাধ্য হয়। এ ধরণের ব্যবস্থায় সংগ্রাহকের আয়তন ৩০-৪০ বর্গফুট হলে, ও জলাধারের ধারণ ক্ষমতা ২০০-৪০০ লিটার হলে এই পদ্ধতিতে ৬০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার ২০০ থেকে ৪০০ লিটার গরম জল পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে এই পদ্ধতির ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। এবং এখনও গবেষণা চলেছে।. মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ইস্রায়েল, অস্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে সোলার ওয়াটার হিটার-এর মাধ্যমে গরম করা জল দিয়ে বাড়ী-ঘর গরম করার প্রথাও চালু হয়েছে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে অন্যান্য শক্তি উৎস যেমন কয়লা, তেল এবং বিদ্যুতের দাম বাড়তে থাকায় সে সব দেশে বাড়ী-ঘর গরম করার ক্ষেত্রে সৌরশক্তির সাহায্যে গরম করা জল ব্যবহারের চাহিদা বাড়ছে। সোলার ওয়াটার হিটারে গরম করা জল দিয়ে বাড়ী-ঘর গরম করার জন্য বিশেষ সামগ্রী দিয়ে বাড়ী-ঘর তৈরী করতে হয় না। সাধারণ উপকরণ দিয়ে বাড়ী-ঘর তৈরীর সময় কেবল গরম জল পরিচালন ব্যবস্থার জন্য একটু সুযোগ রাখতে হয়। তবে এই পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রধান শর্ত যথেষ্ট সৌরশক্তি সংগ্রহের সুযোগ। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যবস্থা সেই সব দেশেই বেশী প্রচলিত হচ্ছে, যেখানে বাড়ী-ঘর গরম রাখার প্রয়োজন আছে এবং যেখানে যথেষ্ট সৌরশক্তি পাওয়া যায়।

সৌরশক্তি ব্যবহারে শীতাতপ ব্যবস্থা (Air Conditioning System) নিয়ন্ত্রণের কাজও চালু হয়েছে। ব্যাপারটা তেমন কিছু জটিল নয়। সাধারণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কোন বাষ্পকে নির্দ্দিষ্ট চাপে রাখা হয়। তারপর এই বাষ্পকে ঠাণ্ডা হবার এবং ঘনীভূত হবার সুযোগ করে দিতে হয়। বাষ্পটি ঘনীভূত হয়ে তরলে পরিণত হবার পর ঐ তরল আবার বাষ্পীভবনের সময় প্রয়োজনীয় তাপ বায়ু থেকে সংগ্রহ করে। এবং হাওয়ার তাপমাত্রা কমে। সৌরশক্তির সাহায্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় কিন্তু চাপ সৃষ্টি করা হয় না। যে পদার্থটি বাষ্পীভবনের জন্য ব্যবহার করা হয় তাকে সৌরতাপে বাষ্পীভূত হবার সুযোগ করে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ঐ বাষ্প আবার ঠাণ্ডা হয়ে তরলে ঘনীভূত হলে তাকে সৌরতাপে বাষ্পে পরিণত করা হয় এবং বাষ্প হবার সময় প্রয়োজনীয় তাপ হাওয়া থেকে সংগৃহীত হয়। ধারাবাহিকভাবে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে শীতলায়ন সম্ভব;

ফলে স্থানীয় হাওয়া শীতল হয়। তবে এইভাবে শীতলায়নের ব্যবস্থা সোলার ওয়াটার হিটারের মত জনপ্রিয় হয়নি। মূল কারণ কম কর্ম দক্ষতা এবং প্রচুর খরচ।

সোলার সেল বা সৌর সেল ঃ

আজকাল সোলার সেল নিয়ে এখানে ওখানে প্রায়ই কথাবার্তা হচ্ছে। প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে সৌরশক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার পর এবার দেখা যাক কিভাবে সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। আধুনিক পৃথিবী বিদ্যুৎ নির্ভর হয়ে ওঠায় সৌরশক্তির বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরের ব্যাপারটি নিয়ে সবাই চিন্তিত।

সোলার সেলের কার্যপ্রণালী ফোটো-ইলেকট্রিসিটি প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। কোন পদার্থর উপর আলোকরশ্মি পড়ে যদি পদার্থটির ইলেকট্রনকে যুক্ত করে তাহলে তাকে বলা হয় ফোটো-ইলেকট্রিক এফেক্ট। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক এইচ আর হার্ৎজ এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন। যদিও ফোটো ইলেকট্রিসিটি বহুদিন আগে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তা নিয়ে বহু গবেষণা হলেও এখনও পর্যন্ত প্রক্রিয়াটির ধর্ম সম্পূর্ণভাবে নির্ধারণ করা যায়নি। সেমিকণ্ডাক্টর সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে ফোটো-ইলেকট্রিসিটির প্রয়োগ ফোটো-ইলেকট্রিসিটির প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। সোলার সেল আসলে সেমিকণ্ডাক্টর জাতীয় যান্ত্রিক কৌশল। সোলার সেল আকারে পাতলা ফিল্মের মত। সোলার সেলে সঞ্চিত সৌরশক্তির ৩ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। সোলার সেলের কার্য-ক্ষমতা নির্ভর করে সূর্যালোকের ঔজ্জ্বল্য, তীব্রতা এবং সোলার সেলের গঠনপ্রণালী ও নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের উপর। একটি সোলার সেলের ক্ষমতা একটি বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর মত। একটি সোলার সেল থেকে ০˙৫ ভোল্টের মত ডি. সি. বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যেতে পারে। কিন্তু কয়েকটি সোলার সেল একত্রে বিভিন্ন কায়দায় সাজিয়ে নিলে তা থেকে যথেষ্ট বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে। এমনকি খুব উচ্চচাপের (কয়েক কিলোভোল্ট) বিদ্যুৎও পাওয়া সম্ভব। অনেকগুলি সোলার সেলকে একত্রিত করে তার বিদ্যুৎ আহরণের ব্যবস্থা করলে সোলার সেলগুলিকে বলে সোলার প্যানেল। বাস্তবে সোলার প্যানেলের প্রথম ব্যবহার হয় ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে।

সোলার সেল-এর কার্যপদ্ধতি ফোটো-ইলেকট্রিসিটি প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি

করে নির্ধারিত হলেও আসলে যে প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তার নাম ফোটো—ভোল্টীয় প্রতিক্রিয়া। ফোটো-ইলেকট্রিক প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে ফোটো-ভোল্টীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। দুটি অসম পদার্থকে পাশাপাশি রেখে তাদের উপর আলো ফেললে পদার্থ দুটির মিলনস্থলে তড়িৎ-চালক বল বা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স উৎপন্ন হয়। ফোটো-ইলেকট্রিক তত্ত্বকে কাজে লাগিয়েই এই ঘটনা ঘটান যায়। ফোটো-ইলেকট্রিক প্রতিক্রিয়া এবং ফোটো-ভোল্টীয় প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক নিয়ে এ পর্যায়ে আলোচনা না করে বরং দেখা যাক ফোটো-ভোল্টীয় প্রতিক্রিয়া কাজে লাগিয়ে কিভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি আহরণ করা যায়। যে সব পদার্থর মধ্যে খুব সীমিতভাবে বিদ্যুৎ পরিবহ ক্ষমতা এবং বিদ্যুৎ অপরিবাহীর ধর্ম একত্রে বর্তমান তাদের বলে সেমিকণ্ডাক্টর। এই ধরণের পদার্থ অন্য পদার্থের সঙ্গে সংযোজনের সময় এদের পরমাণুর যোজ্য ইলেকট্রন, পরমাণুটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না বরং কিছু বিদ্যুৎ পরিবহন করে। জার্মেনিয়াম, সেলিনিয়াম, সিলিকন প্রভৃতির মৌলগুলির এ ধরণের ধর্ম আছে। সেমিকণ্ডাক্টর নির্মাণে এই মৌলগুলিই ব্যবহৃত হয়।
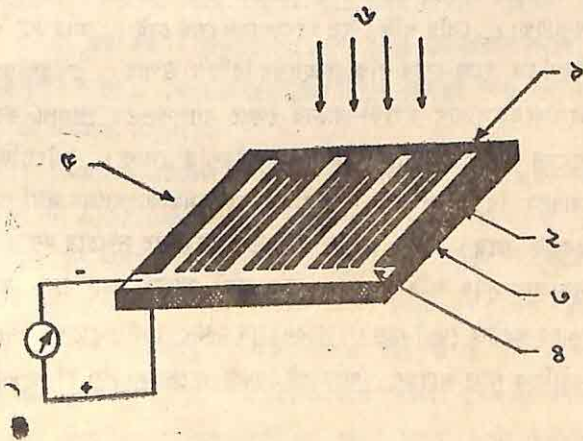
সোলার সেল (সরল রৈখিক উপস্থাপনা)

১। প্রতিফলনবিহীন প্রলেপযুক্ত সংরক্ষক। ২। সিলিকন। ৩। ধনাত্মক ইলেকট্রোড। ৪। ঋণাত্মক ইলেকট্রোড। ৫। আধার। ৬। সূর্যরশ্মি (প্রতি ঘন মিটারে ১০০০ ওয়াট)

সোলার সেল তৈরির অত্যন্ত সহজ প্রক্রিয়া শিল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল সব

রকম দেশেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত কম ক্ষয়ের জন্য, ব্যবহারের সহজ পদ্ধতির জন্য এবং ছোট বড় যে কোন ধরণের আকারে তৈরী করার সুবিধার জন্য সোলার সেলের জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

আগের পৃষ্ঠার ছবিটিতে ব্যাপারটি দেখানো হয়েছে। সেমিকণ্ডাক্টর মৌল নির্মিত ধনাত্মক বা পজিটিভ ইলেকট্রোড আর ঋণাত্মক বা নেগেটিভ ইলেকট্রোড পাশাপাশি রাখা আছে। সূর্যালোক পড়লে তড়িৎ-চালক বল উৎপন্ন হয় এবং সৌর শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সাধারণতঃ একাজের জন্য সমান্তরাল প্লেট ব্যবহার করা হয়। এবং সমান্তরাল প্লেটগুলি সিলিকন, গ্যালিয়াস-আর্সেনিয়াড প্রভৃতি পদার্থে নির্মিত হয়। এইভাবে সৌর শক্তির সাহায্যে বিদ্যুতের উৎপাদন হয়। এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-এর নিহিত ক্ষমতা প্রতি বর্গমিটারে, ১০০-২০০ ওয়াট। তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালী এবং ইস্রায়েল এই কয়টি দেশে সরাসরি সৌর শক্তি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের প্রচেষ্টা হচ্ছে। এই ধরণের বিদ্যুৎ উপাদন কেন্দ্রর সবচেয়ে বড়টি নির্মিত হয়েছে মিশরে। এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রর নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা ৩৭ কিলোওয়াট। সৌর শক্তির ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। বাড়ছে সৌর শক্তির বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরের ব্যবস্থা। সৌর শক্তি নিয়ে গবেষণারও শেষ নেই। আর এই গবেষণার ফলেই উদ্ভাবিত হচ্ছে সৌর শক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন উপায়। সৌরশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ মহাকাশযানের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। মহাকাশযানের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি আসে সৌরশক্তি থেকে। সৌরশক্তি সোলার সেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে মহাকাশযানের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে। তবে সৌরশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মজার কথা হল যে,—মানুষ আজ সূর্যর শক্তি ব্যবহারে যত বেশী সচেষ্ট তার চেয়ে কৃত্রিম সূর্য প্রস্তুতের কাজে অনেক বেশী ব্যস্ত। কৃত্রিম সূর্য অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের সংযোজনের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তি আহরণ ; আর এই বিষয়ে আলোচনা তো ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে।
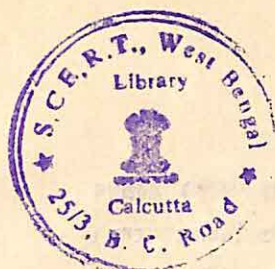
আট

তাপশক্তি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি

ম্যাগনেটো-হাইড্রো-ডায়নামিক উৎপাদন বা এম. এইচ. ডি (Magneto-Hydro-Dynamic Generation) :

সরাসরি তাপশক্তি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি আহরণ আজ আর স্বপ্ন নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাপশক্তি থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা চলছে। যে পদ্ধতিতে তাপ শক্তিকে একেবারে বৈদ্যুতিক শক্তিতে, পরিণত করা হয় তা ম্যাগনেটো-হাইড্রো-ডায়নামিক উৎপাদন বা এম. এইচ. ডি নামে পরিচিত।

অতি উত্তপ্ত গ্যাস প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে সমকোণে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করলে সরাসরি বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। সাধারণ প্রক্রিয়ায় তাপ শক্তির সাহায্যে বাষ্প বা স্টীম উৎপন্ন করে সেই বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন ঘুরানোর ব্যবস্থা করা হয়। আর টারবাইনের সাথে জেনারেটর সংযুক্ত থাকলে জেনারেটর ঘুরতে থাকে। জেনারেটরের ঘুর্ণনে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয় কিন্তু এম. এইচ. ডি পদ্ধতিতে এই জটিলতা নিষ্প্রয়োজন।

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফ্যারাডে কর্তৃক আবিষ্কৃত তড়িৎ-চৌম্বক আবেশের সূত্র (Law of Electromagnetic Induction) এম. এইচ. ডি. প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আহরণের ভিত্তিস্বরূপ। এই সূত্রে বলা হয়েছে, —কোন চৌম্বক ক্ষেত্রে কোন বিদ্যুৎপরিবাহীর অনুপ্রবেশ ঘটলে একটি তড়িৎ-চালক বল (e.m.f.) উৎপন্ন হয়। বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থটির ভৌত ধর্মের উপর তড়িৎ-চালক বল নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থটি কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় যাই হোক না কেন তার জন্য তড়িৎ-চালক বল সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয় না। কোন বিদ্যুৎ পরিবাহী তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের গতিবেগ চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়ায় যে অবস্থা সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে আলোচনার বিষয়কে ম্যাগনেটো-হাইড্রো-ডায়নামিকস্ বলে।

১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে আর্থার কান্ট্রোউইৎজ্ (Arthu Kantrowitz) সর্বপ্রথম এম. এইচ. ডি পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কার্যকরী পদ্ধতি নির্ধারণ করেন। পরবর্তীকালে এম. এইচ. ডি প্রসঙ্গে আগ্রহ বাড়ে এবং এ ব্যাপারে গবেষণার কাজও বাড়তে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাভকো-এভারেস্ট রিসার্চ ল্যাবরেটারী এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করছে। এম. এইচ. ডি পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ আহরণের সুবিধা হল,—

১। সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি সরল।

২। কোন জটিল ঘূর্ণায়মান যন্ত্রাংশের প্রয়োজন নেই।

৩। আকার সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতা না থাকায় সমগ্র ব্যবস্থাটি যে কোন আকারে তৈরী করা যায়। ফলে কার্যকরী ক্ষমতাও ইচ্ছানুযায়ী কমান বা বাড়ান যায়।

সংশ্লিষ্ট ছবিতে এম. এইচ. ডি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে একটি আন্দাজ দেওয়া হয়েছে।
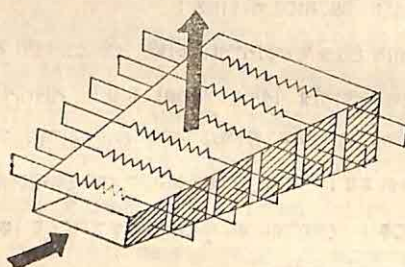
এম. এইচ. ডি. প্রক্রিয়া।

একটি নল বা ডাকট্ (duct) হল এম. এইচ. ডি পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান যন্ত্রাংশ। নলটির ব্যাস ক্রমশঃ সরু থেকে মোটা হয়ে গেছে। এই নল দিয়ে অতি উত্তপ্ত গ্যাস সরুদিক থেকে মোটা দিকে পাঠানো হয়। গ্যাসের গতির সাথে সমকোণে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য একটি ফিল্ড কয়েল (field coil) নলটির সাথে সমকোণে স্থাপন করা হয়। ফলে উভয়ের সাথে সমকোণ সৃষ্টিকারী তড়িৎ-চালক বল সৃষ্টি হয়। গ্যাসকে বিদ্যুৎ পরিবাহী করে তোলার জন্যই তাকে উচ্চ তাপ মাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়। গ্যাসের পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গ্যাসের সাথে কিছুটা পটাশিয়াম মাঝে মাঝে মেশানো হয়। গ্যাসকে অত্যন্ত

উত্তপ্ত করলে গ্যাস আয়নিত হয়। সাধারণতঃ গ্যাসকে ২০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়।
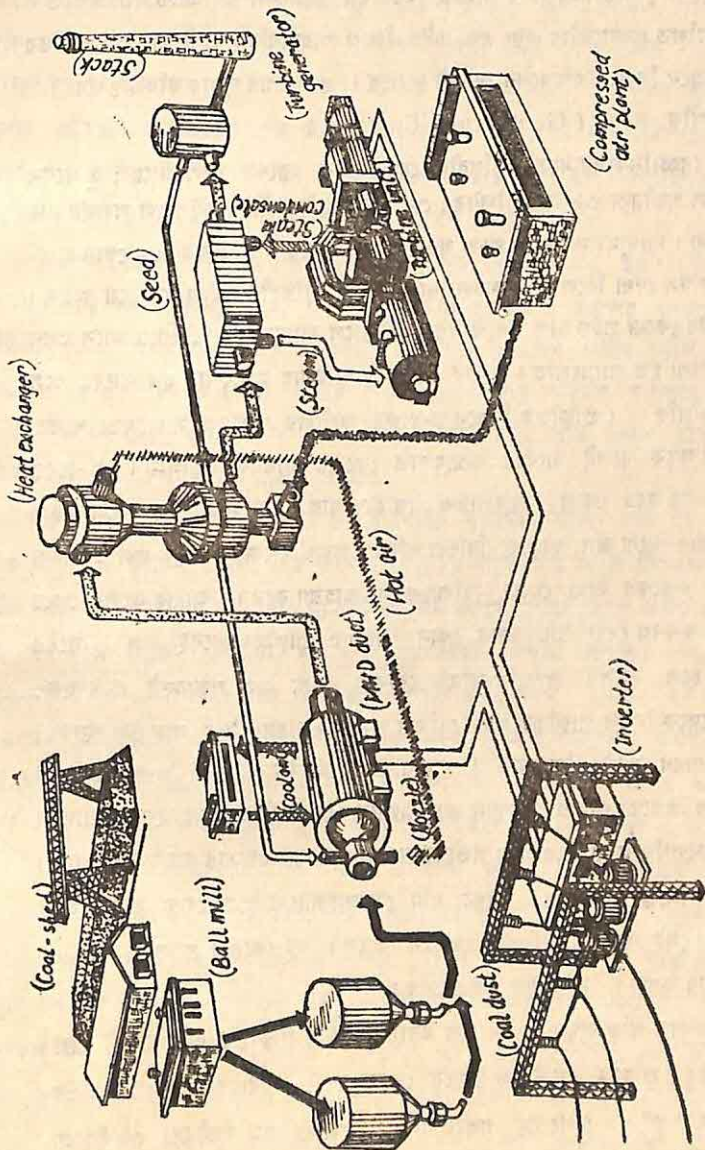
তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প সহ এম. এইচ. ডি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

এম. এইচ. ডি পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চিন্তা নতুন নয়। কিন্তু গ্যাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করার পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় তাপসহ ধাতু সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত হয়েছে। আজকাল এম. এইচ ডি. পদ্ধতি ও বাষ্পচালিত জেনারেটার এবং এম. এইচ. ডি ও পারমাণবিক বা নিউক্লিয়ার পদ্ধতির সংযোজনে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচেষ্টা চলেছে। (আগের পৃষ্ঠার ছবিটি দ্রষ্টব্য)

ভূতাপীয় শক্তি (Geothermal Energy) ঃ

বৈজ্ঞানিকদের মতে—পৃথিবীর কেন্দ্রে এক ধরণের তরল আছে ; ভূ-ত্বকের সাধারণ গভীরতা ৩২ কিলোমিটার ; ৩২ কিলোমিটার নীচের এই তরল পদার্থর নাম ম্যাগ্‌মা। ম্যাগ্‌মা সব সময় প্রচণ্ড গরম অবস্থায় থাকে। ভূ-ত্বকের মধ্যে কোন জায়-গায় ফাটল দেখা দিলে সেই ফাটল দিয়ে ম্যাগ্‌মা পৃথিবীর বাইরে বেরিয়ে আসে। পৃথিবীর কেন্দ্রে প্রচণ্ড চাপ উদ্ভূত হয়। এই চাপে ম্যাগ্‌মা যখন বেরিয়ে আসে তখন তাকে বলা হয় অগ্ন্যুৎপাত। আর যে সমস্ত জায়গায় অগ্ন্যুৎপাত হয় তাদের বলে আগ্নেয়গিরি। (প্রাকৃতিক নিয়মে ভূ-ত্বকের ফাটলের বহির্মুখ সাধারণতঃ পার্বত্য অঞ্চলে থাকে বলেই বাংলায় অগ্ন্যুৎপাত কেন্দ্রের নাম আগ্নেয়গিরি।) ভূ-ত্বকের ফাটল বন্ধ হয়ে গেলে অগ্ন্যুৎপাতও বন্ধ হয়ে যায়। ভূ-ত্বকের ৩২ কিলোমিটার গভীরতার মধ্যে জল ছাড়াও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ থাকে। মানুষ জল ও খনিজ পদার্থ ভূ-ত্বকের মধ্যে থেকে বিভিন্নভাবে আহরণ করে। আবার জলের ক্ষেত্রে কখনও কখনও দেখা যায় কোন কোন জায়গায় প্রাকৃতিকভাবেই জল ভূ-পৃষ্ঠের উপর চলে আসে। স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আসা জল স্বভাবতই গরম হয় ; ভূগর্ভ থেকে নির্গত প্রাকৃতিক জল বেরিয়ে আসার জায়গাগুলির নাম উষ্ণ প্রস্রবণ ; উষ্ণ প্রস্রবণ সৃষ্টির পিছনেও ম্যাগ্‌মার যথেষ্ট অবদান আছে ; ভূ-ত্বকের কোন জায়গায় হয়তো জলের অবস্থান এত গভীরে এবং সেই জায়গায় হয়তো ম্যাগ্‌মা ৩২ কিলোমিটারের চেয়ে কম গভীরতায় আছে ফলে ম্যাগ্‌মার তাপে জল আপনা থেকেই উত্তপ্ত হয়ে যায়। এখন যদি সে জায়গায় ভূ-ত্বকে কোন ফাটল সৃষ্টি হয় তবে সেই ফাটল দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। ভূ-কেন্দ্রের প্রচণ্ড চাপই এই নির্গমনের কারণ। সৃষ্টি হয় উষ্ণ প্রস্রবণ।

ভূ-তাপ শক্তি অর্থাৎ জিওথার্মাল এনার্জির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক এই নিয়মটি পালন করা হয়। ভূ-ত্বকে একটি নল বসিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণ নলকূপ বা টিউব-ওয়েলের মতই। তফাৎ শুধু গভীরতায়। ভূ-ত্বকের গড় গভীরতা ৩২ কিলো-

মিটার হলেও এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে তার চেয়ে অনেক কম গভীরতাতেই ম্যাগ্‌মা পাওয়া যায়। ভূ-তাত্ত্বিকেরা সেই জায়গাগুলি নির্ণয় করে দেন। ভূ-ত্বকে নল অনুপ্রবেশ করানোর অর্থ হল ভূ-ত্বকে একটি ফাটল সৃষ্টি করে ম্যাগ্‌মার কাছাকাছি পৌঁছানো। ম্যাগ্‌মা এতই গরম যে ভূ-ত্বকের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত তার তাপ পাওয়া যায়। প্রথমে যে নলটি বসান হয় তার ঠিক কেন্দ্রে আরেকটি অপেক্ষাকৃত কম ব্যাসের নল বসান হয়। তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াল, একই কেন্দ্র বরাবর দুটি নল ভূ-পৃষ্ঠে উলম্ব অবস্থায় বসান হল। সাধারণতঃ এই নলগুলিকে ভূ-ত্বকে ২৭০০ মিটার পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করালেই চলে।

এখন বাইরের নলটি দিয়ে ঠাণ্ডা জল ভূ-কেন্দ্রের দিকে পাঠান হয়। ভূ-কেন্দ্রের প্রচণ্ড তাপের প্রভাবে সেই জল বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। বাষ্পের সাধারণ গতি উর্ধমুখী। প্রচণ্ড চাপে ঐ বাষ্প ভিতরের নল দিয়ে ভূ-ত্বকের বাইরে বেরিয়ে আসে। ভূ-ত্বকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা এই বাষ্পের পরিমাণ সাধারণতঃ ঘণ্টায় ৪০০০০ থেকে ৮০০০০ পাউণ্ড। তবে ২ লক্ষ পাউণ্ড প্রতি ঘণ্টায় চাপ এইভাবে নির্গত বাষ্পের থেকে পাওয়া গেছে।

প্রচণ্ড চাপে নির্গত এই বাষ্প দিয়ে টারবাইন ঘুরানোর ব্যবস্থা করা হয়। আর টারবাইন ঘুরানো গেলে তার সঙ্গে জেনারেটর সংযুক্ত করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কঠিন কাজ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোর উত্তরে জেয়ার্স নামক জায়গায় ১২ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়েছে, যেখানে ভূ-তাপ শক্তিকে কাজে লাগানো হয়। জেয়ার্সের জিওথার্মাল পাওয়ার প্ল্যাণ্টের দ্বিতীয় ইউনিটের নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা ১৪ মেগাওয়াট, এটি ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়েছে। জেয়ার্সের তৃতীয় ও চতুর্থ ইউনিট ১৯৬৭ এবং ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়েছে। জেয়ার্সের ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০নং ইউনিটের প্রতিটির নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা ৫৫ মেগাওয়াট। শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয়, ইতালী, নিউজিল্যাণ্ড, মেক্সিকো, জাপান, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আইসল্যাণ্ডেও বর্তমানে জিওথার্মাল এনার্জি অর্থাৎ ভূ-তাপ শক্তিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানো হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে আগ্নেয়গিরি এলাকায় আর বাইরে থেকে জল অনুপ্রবেশ করাতে হয় না। ভূ-ত্বকের ভিতরের জল, বেরোবার জায়গা পেয়ে প্রচণ্ড তাপের ফলে বাষ্পে পরিণত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। ভূ-তাপীয় শক্তির প্রথম ব্যবহার ইতালীতে হয়। তবে এখনও পর্যন্ত যা

জানা গেছে তার থেকে এই ধারণাই করা হয় যে পৃথিবীতে যে সব অঞ্চলে আগ্নেয়-গিরির প্রাদুর্ভাব আছে সেই সব অঞ্চলেই ভূ-তাপীয় শক্তির ব্যবহারের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর পশ্চিমাঞ্চল, জাপান, তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস্, নিউজিল্যাণ্ড, বহু প্রশান্ত মহা-সাগরীয় দ্বীপ, পূর্ব আফ্রিকার বিরাট অঞ্চল এবং গ্রীস, টার্কি ইরান, আফগানিস্তান, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশেই ভূ-তাপীয় শক্তির ভবিষ্যৎ ভাল বলে মনে করা হচ্ছে।

আইসল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশে ভূ-তাপীয় শক্তি গাছ পালা রক্ষণা-বেক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঘর বাড়ীর শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কাজে নিউজিল্যাণ্ডে ভূ-তাপীয় শক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। ঐ দেশে কাগজ কলের প্রয়োজনেও ভূ-তাপীয় শক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া অন্যান্য বেশ কিছু দেশে বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে ভূ-তাপীয় শক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে যেভাবেই ভূ-তাপীয় শক্তির ব্যবহার হোক না কেন, ভূ-তাপীয় শক্তি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি আহরণই প্রধান লক্ষ্য।

থার্মাল কন্‌ভার্টার (Thermal Convertor):

তাপশক্তি থেকে সরাসরি বৈদ্যুতিক শক্তি আহরণের যে কটি পদ্ধতি আছে থার্মাল কনভার্টার পদ্ধতি তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। যদিও এই পদ্ধতির কার্য ক্ষমতা সর্বনিম্ন। তবে থার্মাল কনভার্টারের সব চেয়ে সুবিধা হল এতে কোন গতিশীল অংশ নেই, উচ্চ চাপের প্রয়োজন নেই, যে কোন ভাবে সংগৃহীত তাপশক্তি ব্যবহার করা চলে, দীর্ঘদিন কার্যক্ষম থাকে। মহাকাশযান, মিসাইল, সাবমেরিন প্রভৃতিতে থার্মাল কনভার্টারের ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবার সুযোগ আছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জাপান ও অন্যান্য বহু দেশে থার্মাল কনভার্টার নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ চলেছে।

নয়

রাসায়নিক শক্তি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি

কয়লা বা পেট্রোলিয়াম জাত তেল হল বৈদ্যুতিক শক্তি আহরণের প্রচলিত উপাদান। কয়লা ও পেট্রোলিয়াম সম্পর্কে আলোচনা ইতিপূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে। কয়লা বা পেট্রোলিয়াম থেকে কিভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি সংগৃহীত হয় সে প্রসঙ্গে একটু খবর নেওয়া দরকার। কয়লা বা পেট্রোলিয়াম হল মূলতঃ রাসায়নিক শক্তির আধার। সুতরাং কয়লা বা পেট্রোলিয়াম থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন আদতে রাসায়নিক শক্তিরই বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর মাত্র।

কয়লা থেকে বিদ্যুৎ ঃ

তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা থার্মাল পাওয়ার স্টেশন ইত্যপ্রকার কথা আজকাল প্রায়ই শুনতে হয়। পরের পৃষ্ঠার ছবিটিতে সহজভাবে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটা ধারণা পাওয়া যাবে। বাঙ্কার-এ (১) কয়লা এসে জমা হয়। বাঙ্কার থেকে কয়লা চলে যায় পালভারাইজার-এ (২)। পালভারাইজার-এ কয়লা গুঁড়ো হয়। গুঁড়ো কয়লা ফ্যান (পাখা)-এর (৩) সাহায্যে পাঠানো হয় ফার্নেস-এ (৪)। ফার্নেসে কয়লার দহন হয়। কয়লা জ্বললে যে তাপ সৃষ্টি হয় সেই তাপের সাহায্যে বয়লারের (৫) জলকে বাষ্পে পরিণত করা হয়। বয়লার ড্রাম-এ (৬) জল আসে পাম্প-এর (১৬) মাধ্যমে। এই জল আবার কয়েল (৭) মারফৎ আনা হয়। অতি উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পকে স্ট্যাক-এর (৮) মাধ্যমে টারবাইনের দুটি অংশে (৯ এবং ১০) পাঠান হয়। ফলে টারবাইন ঘুরতে শুরু করে। অর্থাৎ রাসায়নিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হল। টারবাইন ঘুরবার সাথে সাথে সংযুক্ত জেনারেটর (১১) ঘুরতে শুরু করে। আর জেনারেটর ঘুরবার অর্থ বিদ্যুৎ উৎপাদন। জেনারেটরের মাধ্যমে যান্ত্রিক শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হলে সেই বিদ্যুৎ-কে টার্মিনাল-এর (১২) মাধ্যমে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়। এদিকে ব্যবহৃত বাষ্পকে কনডেনসার-এ (১৫) নিয়ে যাওয়া হয়। কনডেনসার-এর সাথে কুলিং টাওয়ার বা কোন জলাধার বা নদীর (১৩) সংযোগ থাকে। সেখান থেকে অতিরিক্ত জল সরবরাহ করে বাষ্পকে দ্রুত জলে পরিণত করা

হয়। একাজে সাহায্য করার জন্য একটি পাম্প (১৪) ব্যবহার করা হয়। আর কনডেনসার থেকে জল বয়লারে পাঠাবার জন্য যে পাম্পটি (১৬) ব্যবহৃত হয় তার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।
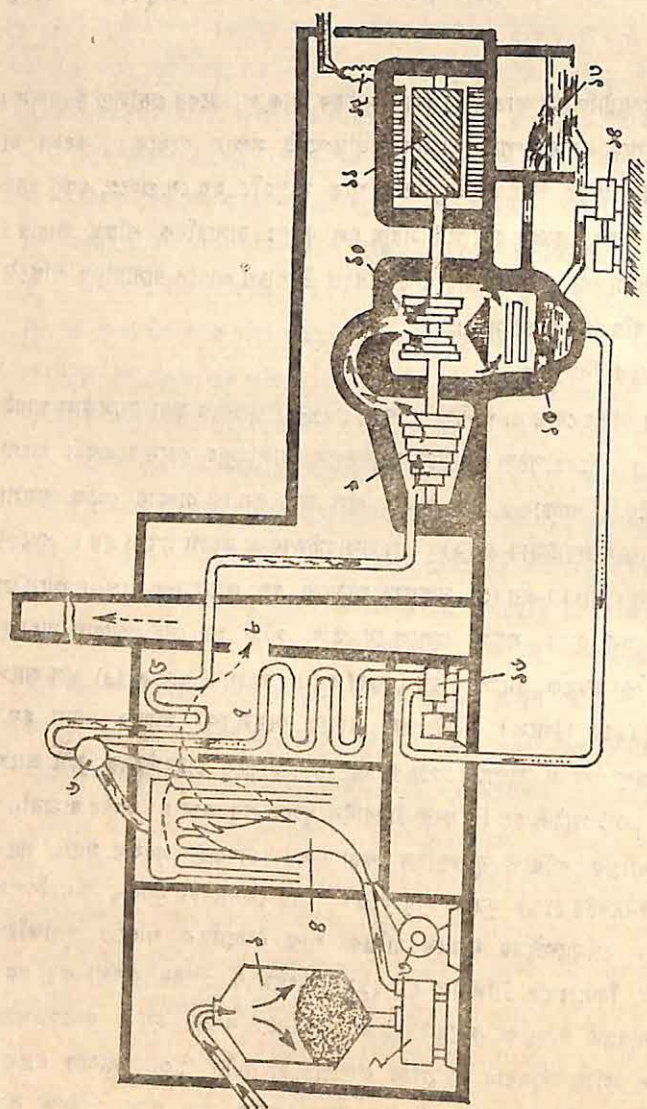
তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সরল রৈখিক উপস্থাপনা)

সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি ছবি সহযোগে অত্যন্ত সহজভাবে বর্ণনা করা হল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সমস্ত যন্ত্র-যন্ত্রাংশ সমন্বিত একটি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রর কর্মকাণ্ড কিন্তু বেশ জটিল। বয়লার বা ষ্টীম জেনারেটরটিই পাঁচতলা বাড়ীর সমান উঁচু। এখানে ১৫০০ থেকে ২০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা সৃষ্টি করা দরকার। কয়লা এমন গুঁড়ো করতে হয় যাতে প্রতি বর্গ ইঞ্চি জায়গায় ২০০ থেকে ২২৫টি কয়লার গুঁড়ো থাকতে পারে। তাছাড়া পাম্পের কার্যক্ষমতা, ফ্যানের দক্ষতার দিকে নজর রাখতে হয়। সর্বোপরি আছে জটিল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

এত জটিল পদ্ধতিতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ, ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছাবার প্রক্রিয়াটিও জটিল। প্রথমতঃ তড়িৎ চালক বলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয় ট্রান্সফর্মার-এর সাহায্যে। আবার প্রয়োজন অনুযায়ী তার চাপ কমাতে হয় ট্রান্সফর্মারেরই সাহায্যে। সে পদ্ধতি জটিল হলেও খুবই আগ্রহ সৃষ্টিকারী। কিন্তু আপাততঃ সে প্রসঙ্গে না গিয়ে বরং একটু জেনে রাখা যাক থার্মাল পাওয়ার ষ্টেশন আর সুপার থার্মাল পাওয়ার ষ্টেশনের মধ্যে কতটুকু তফাৎ। একটি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যদি একটি জেনারেটরের নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা সর্বাধিক ৪০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত হয়, তাকে থার্মাল পাওয়ার ষ্টেশন বা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বলে। আর সুপার থার্মাল পাওয়ার ষ্টেশনে একটি জেনারেটরেরই নিহিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নূন্যতম ৪০০ মেগাওয়াট। উৎপাদনের পরিমাণের তারতম্য নিশ্চিতভাবে পার্থক্য ঘটায় যন্ত্র বা যন্ত্রাংশে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সমস্ত প্রকল্পের নির্মাণ প্রণালীতে বিরাট ফারাক ঘটে।

ডিজেল জেনারেটর :

আপাত দৃষ্টিতে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত তাপবিদ্যুৎ এবং ডিজেল জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য নেই। মূলতঃ নীতিটি সমান। রাসায়নিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা আবার যান্ত্রিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। তফাতের মধ্যে শুধু রাসায়নিক শক্তির আধারের ভৌত আকৃতি। তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয় কঠিন জ্বালানী কয়লা আর ডিজেল জেনারেটরে রাসায়নিক শক্তির উৎসরূপে ব্যবহৃত হয় পেট্রোলিয়ামজাত তরল পদার্থ ডিজেল। কিন্তু এই সামান্য পার্থক্যই বিরাট পরিবর্তন ঘটায় উৎপাদন পদ্ধতিতে। ডিজেল জেনারেটর অনেক ছোট আকারে নির্মাণ করা যায়। প্রয়োজনে তাকে পরিবহন যোগ্যও করে তোলা যায়। কিন্তু তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এমন কথা কল্পনা করা যায় না।
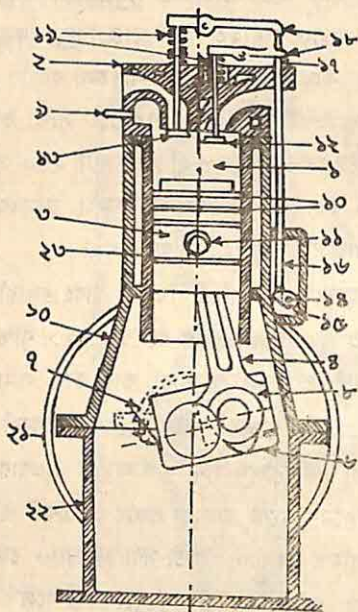
ডিজেল ইঞ্জিন (প্রস্থচ্ছেদ চিত্র)

ডিজেল জেনারেটরের প্রধান অংশ হল একটি ডিজেল ইঞ্জিন। ডিজেল ইঞ্জিনে সিলিণ্ডার (১), সিলিণ্ডার হেড (২), পিষ্টন (৩), কানেক্টিং রড (৪), ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট্ (৫), ক্র্যাঙ্ক ওয়েব (৬), মেন বিয়ারিং (৭), ক্র্যাঙ্ক পিন অ্যাণ্ড বিয়ারিং (৮), ফুয়েল নজ্‌ল্ (৯), পিস্টন রিং (১০), পিষ্টন পিন অ্যাণ্ড বিয়ারিং (১১), ইনটেক ভাল্ভ (১২), এক্সহস্ট ভাল্ভ (১৩), ক্যাম শ্যাফ্‌ট (১৪), ক্যাম (১৫), ক্যাম ফলোয়ার (১৬), পুশ রড্ (১৭), রকার আর্মস (১৮), ভাল্‌ভ স্প্রীংস্ (১৯), ক্র্যাঙ্ক কেস (২০), ফ্লাই হুইল (২১), বেড প্লেট (২২), কুলিং ওয়াটার জ্যাকেট (২৩), এই ২৩টি প্রধান যন্ত্রাংশ থাকে। সংশ্লিষ্ট ছবিতে বিভিন্ন যন্ত্রাংশের অবস্থান উপস্থাপিত হয়েছে।

ডিজেল ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারের মধ্যে জ্বালানীর দহনেই ইঞ্জিন কার্যক্ষম হয়। সিলিণ্ডারের মধ্যে জ্বালানীর দহন সিলিণ্ডারে বাড়তি তাপ ও চাপ সৃষ্টি করে। বর্ধিত চাপে পিস্টন সিলিণ্ডার থেকে বেরিয়ে পড়ে। পিস্টনের নির্গমনে যান্ত্রিক শক্তি সৃষ্টি হয়। এই যান্ত্রিক শক্তিকে আবার কানেক্টিং রডের সাহায্যে ক্র্যাঙ্ক

শ্যাফ্‌টকে ঘুরাবার কাজে ব্যবহার করা হয়। ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌ট ঘুরানো গেলেই ডিজেল ইঞ্জিন চালাবার উদ্দেশ্য সার্থক হয়। কারণ তারপর বাকী থাকে শুধু জেনারেটরের ঘূর্ণন প্রক্রিয়া। ডিজেল জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ডিজেল ইঞ্জিন ও ডিজেল জেনারেটরের সংযুক্তিকরণ একান্তই আবশ্যক। সুতরাং ডিজেল ইঞ্জিনের ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌ট্‌ ঘুরলে জেনারেটর ঘুরবেই। আর তা হলেই যান্ত্রিক শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ করবে;

গ্যাস টারবাইন ঃ

বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র হিসাবে গ্যাস টারবাইন হালে আমাদের কাছে পরিচিত হলেও এটা শুধুমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজেই ব্যবহৃত হয় না। যন্ত্রটি হাল্কা এবং ধীরগতি সম্পন্ন হওয়ায় উড়োজাহাজে প্রপালসান ইঞ্জিন (যে ইঞ্জিন উড়োজাহাজকে সম্মুখ-দিকে চালনা করে) হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কারখানায় পাইপলাইনের মধ্য দিয়ে গ্যাস পরিচালনার জন্যও গ্যাস টারবাইন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
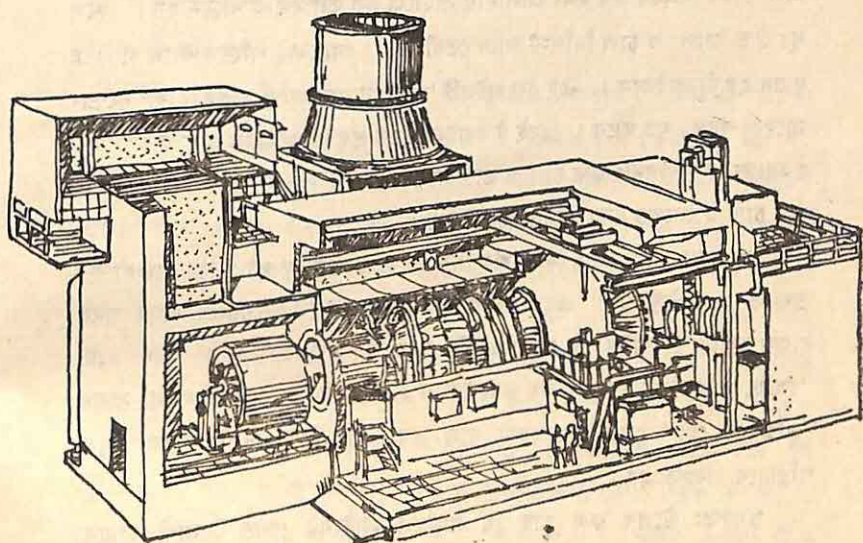
গ্যাস টারবাইন

ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যায় যে ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে জন বারবার সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ "গ্যাস টারবাইন" আবিষ্কার করেন। এরপর বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বহু-

দেশের বহু বিজ্ঞানী এটি তৈরী করলেও তা ছিল খুব কম ক্ষমতা সম্পন্ন এবং আকৃতিতে বিরাট বড়। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী ব্রাউন বভার সর্বপ্রথম একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন "গ্যাস টারবাইন" তৈরী করেন। এটি একটি ৪০০০ কিলোওয়াটের জেনারেটর চালনার কাজে ব্যবহৃত হয়। এরপরই উড়ো-জাহাজের ক্ষেত্রে এটির প্রয়োজনীয়তা জানার পর এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। এবার অতি সংক্ষেপে গ্যাস টারবাইনের বর্ণনায় আসা যাক। এই যন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হল একটি টারবাইনকে ঘুরান এবং এই টারবাইনকে ঘুরান হয় উচ্চ চাপ এবং তাপ সম্পন্ন গ্যাসের শক্তির সহায়তায়। তাই এই যন্ত্রের নাম "গ্যাস টারবাইন"।

কাজে কাজেই যন্ত্রের বর্ণনা দিতে হলে প্রথমেই বলতে হয় সেই অংশের কথা যেখানে খুব উচ্চ তাপ ও চাপ বিশিস্ট গ্যাস প্রস্তুত হয়। এই আশের নাম 'কম্প্রে-সার'। এই অংশে প্রথমে বাতাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সেই বাতাসের চাপ ক্রমশ বাড়ান হয় এবং জ্বালানীর সাহায্যে এর তাপমাত্রাও বাড়ান হয়। ফলে খুব উচ্চ তাপ ও চাপ বিশিস্ট গ্যাস তৈরী হয়। এবার এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ঘুরান হয় টারবাইনকে। এই টারবাইনটি 'শ্যাফ্‌ট' নামক এক দণ্ডের দ্বারা কম্প্রে-সারের সাথে যুক্ত থাকে। যেই টারবাইন ঘুরতে শুরু করে অমনি গ্যাসের শক্তি ক্ষয় হওয়া শুরু হয় অথর্থাৎ তার চাপ ও তাপ কমতে থাকে। তখন সেই পূর্বের প্রথায় তার চাপ ও তাপের মাত্রা আবার বাড়ান হয়।

প্রধানতঃ আকৃতিগত বৈশিষ্টের দিক দিয়ে 'কম্প্রেসার' দুই প্রকার হয়ে থাকে। প্রথমত "সেন্ট্রিফ্যুগাল" এবং দ্বিতীয়তঃ "এক্সিয়াল ফ্লো" ধরণের। এদের সাথে ব্যবহারযোগ্য টারবাইন ও যথাক্রমে উপরোক্ত দুই প্রকারেরই হয়। এদের মধ্যে "সেন্ট্রিফ্যুগাল" ধরণের দাম কম এবং বিকল হওয়ার আশঙ্কা কম থাকা সত্ত্বেও "এক্সিয়াল ফ্লো" আকৃতিতে ছোট বলে এবং পারদর্শিতা বেশী থাকায়, বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে গ্যাস টারবাইনের ক্ষেত্রে জ্বালানী হিসাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় "প্রাকৃতিক গ্যাস"। তবে প্রাকৃতিক গ্যাসের অভাবে পেট্রোলিয়ামজাত ডিজেল দিয়েও কাজ চালান হয়। সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যবস্থায় সামান্য পরিবর্তন দরকার হয়।

দশ

শক্তির অন্যান্য উৎস

কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস—কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় এই তিন জাতীয় জ্বালানী বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হলেও অন্যান্য যে সব সূত্র থেকে বহুল পরিমাণে শক্তি সংগৃহীত হয় তাদের ভূমিকা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আরও কিছু কিছু পদার্থ শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে কয়েকটি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার কয়েকটির শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার, সবে শুরু হয়েছে। শক্তির জগতে সদ্য আগত উৎসর ব্যবহার উন্নত দেশগুলিতে বাড়ছে। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে ব্রাত্য বহু পদার্থ শক্তি উৎস হিসেবে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলিতে আজও ব্যবহৃত হচ্ছে।

জ্বালানী কাঠ (Firewood) ঃ

কাঠকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করতে আমরা অভ্যস্ত। জ্বালানী কাঠ বা ফায়ার উড ভারতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ফায়ার উড কেবলমাত্র জঙ্গলের গাছ থেকেই পাওয়া যায় না। জঙ্গলের বাইরে অন্যত্র অবস্থিত গাছের কাঠকেও ফায়ার উড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ফায়ার উড বা কাঠ থেকে তাপশক্তি পাওয়ার জন্য তেমন কোন বিশেষ পদ্ধতিতে কাঠকে ব্যবহার করার দরকার হয় না। কাঠে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম হলেই সেই কাঠ ভাল দাহ্যে পরিণত হয়। আর এ ব্যবস্থা বহু প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত আছে, এবং দরিদ্র দেশগুলিতে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস হিসেবে আজও বহুল ব্যবহৃত। ভারতবর্ষে ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বর্ষে ১৬০০ লক্ষ টন কাঠ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে আন্দাজ করা হয়। প্রতি টন ফায়ার উড থেকে ৪.৭৫ কিলো ক্যালরি তাপশক্তি পাওয়া যায়। অর্থাৎ ফায়ার উডে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ বড় কম।

প্রাণী বিষ্ঠা ঃ

প্রাণীর বিষ্ঠাও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং প্রাণীর বিষ্ঠাও

শক্তির এক রকম উৎস। সাধারণতঃ গোবর এই কাজে প্রচলিত। গোবর বা ঐ ধরনের অন্য পদার্থ শুকিয়ে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে তার থেকে তাপ শক্তি সংগ্রহ করা হয়। দরিদ্র দেশগুলিতেই প্রাণী বিষ্ঠার জ্বালানীরূপে ব্যবহার বেশী। যেমন ভারতে ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বর্ষে ২০৫০ টন প্রাণী বিষ্ঠা জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করা হয়। গোবর বা ঐ ধরণের পদার্থর অন্তর্নিহিত শক্তি বড় কম।

গরু-মহিষ প্রভৃতি গবাদি পশুর মল কাজে লাগিয়ে তার থেকে গ্যাস তৈরী করে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভারতবর্ষসহ বিভিন্ন আফ্রো-এশীয় দেশে গোবর গ্যাসের ব্যবহার বাড়ছে। রান্নার কাজে জ্বালানী ছাড়াও এই গ্যাস দিয়ে বাতি জ্বালানো সম্ভব। তবে দারিদ্রর জন্য গোবর গ্যাস প্ল্যাণ্ট চালু করার কাজে প্রয়োজনীয় গবাদি পশুর অভাবে ব্যাপারটি তেমন জনপ্রিয় হতে পারছে না। গোবর গ্যাস যে পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় সেই একই পদ্ধতিতে মানুষের বিষ্ঠা থেকেও জ্বালানী গ্যাস তৈরী সম্ভব। কিন্তু শৌচাগার ব্যবহারের সুযোগ ও অভ্যাস না থাকায় এবং কুসংস্কারের জন্য এই পদ্ধতি এখনও জনপ্রিয় হয়নি।

কৃষিজ অবশেষ ঃ

কৃষিজ অবশেষও জ্বালানীর কাজে প্রযুক্ত হয়। অতএব কৃষিজ অবশেষও শক্তির উৎস। খড়, ভুট্টা, গমের কৃষিজ অবশেষ (সাধারণভাবে ভুট্টা বা গমের ডাঁটি বলে পরিচিত) পাট কাঠি প্রভৃতি পদার্থ জ্বালানীরূপে ভালই ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরণের পদার্থই দরিদ্র জনসাধারণের শক্তি সংগ্রহের মূল উপাদান। তারা কাঠ, গোবর বা খড়, পাট কাঠি ব্যবহার করতে অনেক বেশী অভ্যস্ত। শুধু ভারতেই ১৯৭৫-৭৬ আর্থিক বর্ষে ২০৩৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন উদ্ভিজ অবশেষ জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এক টন উদ্ভিজ অবশেষ থেকে সাকুল্যে ৪·২ কিলো-ক্যালরি তাপ শক্তি পাওয়া যায়।

উপরোক্ত শক্তি উৎসগুলি প্রধানতঃ গৃহস্থালীতেই ব্যবহৃত হয়। তবে আজকাল এই ধরনের শক্তি উৎসকে অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবহার করে অন্যান্য কাজে লাগানো হচ্ছে।

পাওয়ার অ্যালকোহল ঃ

পাওয়ার অ্যালকোহলের কথা না বললে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হবে। সাধারণতঃ গুড়, চিনি, দানাশস্য, আলু, কাগজমণ্ডর অবশেষ, হাইড্রোকার্বন

গ্যাস প্রভৃতি থেকেই পাওয়ার অ্যালকোহল তৈরী হয়। পেট্রোলের সঙ্গে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত পাওয়ার অ্যালকোহল মিলিয়ে তা গাড়ীতে ব্যবহার করা যায়। এতে কিছু পেট্রোলের সাশ্রয় হয়।

বাতাস শক্তি (Wind Energy) ঃ

আদিম মানুষ ভয় পেত হাওয়াকে। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে, মানুষ অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির মত হাওয়া অর্থাৎ বাতাসকেও তার কাজে লাগাতে শিখল। যে বাতাসকে মানুষ কেবলমাত্র শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভয় করত আস্তে আস্তে সেই বাতাসকে মানুষ তার দৈহিক শক্তির পরিবর্ত শক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে শিখল।

আজ থেকে অনেকদিন আগেই মানুষ দেখেছিল যে চার পাঁচটা পাখার সমন্বয়ে যদি একটি চক্র তৈরী করা যায়, আর সেই চক্রকে যদি বাতাসের সামনে রাখা যায় তাহলে সেই চক্রটি ঘোরে। বাতাসের জোরে বওয়া, আস্তে বওয়ার উপর নির্ভর করে চক্রের ঘোরার গতি। মানুষ এটুকুও বুঝেছিল যে চক্রের মূল অক্ষদণ্ডর সাথে কুয়োর দড়িটাকে একটু কায়দা করে সংযুক্ত করতে পারলে কুয়ো থেকে আর হাতে টেনে জল তুলতে হয় না। সুতরাং বাতাসকে কাজে লাগিয়ে মানুষ পানীয় জল ও কৃষিকার্যের জল সংগ্রহর কাজটাকে সহজ করে তুলল ; একই ব্যবস্থায় মানুষ আরও অনেক কাজই করতে শিখেছিল যার ফলে তার দৈহিক শক্তির ব্যবহার অনেকটা কমে গেল। কি কি কাজ ? যব অথবা গম ভাঙ্গানো, আখ মাড়াই, ধান কোটা, খড় কাটা ইত্যাদি কাজে ব্যাপকভাবে বাতাসকে কাজে লাগানো হত। বাতাসকে কাজে লাগিয়ে কাঠ চেরাইয়ের মত দুরূহ কাজও মানুষ করেছিল। পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই এ ধরণের কাজে মানুষ বাতাসকে বড় বড় চক্রাকার এক ধরনের যন্ত্র, যার চলতি নাম হাওয়া কল বা উইণ্ড মিল (Wind Mill), তার মাধ্যমে নিজের কাজে লাগাত। প্রতি মুহূর্তে উন্নতি-অগ্রগতির অন্বেষণে নিরত মানুষ, হাওয়া-কলকে বাতিল করেছিল সেদিন, যেদিন আরও সুবিধার সন্ধান সে পেয়ে গেল। বাষ্প-চালিত, বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রাদি হাতের মুঠোয় আসায় হাওয়া-কল নামক বস্তুটি সম্ভবতঃ হারিয়ে গেল। তারপর যেদিন খনিজ তৈল (পেট্রোলিয়ামজাত তৈলাদি) তার করায়ত্ত হল সেদিন তো সবাই ভুলেই গেল বাতাস পরিচালিত হাওয়া কলের কথা। কিন্তু আজ টান পড়েছে কয়লার ভাঁড়ারে, তেলের অবস্থাও সুবিধার নয়। তার উপর ক্রমাগত দাম বাড়ার ফলে সবাই আবার নতুন করে ভাবছে হাওয়া কল বা wind mill-এর কথা। তবে পুরনো আমলের হাওয়া

কলের থেকে আজকের হাওয়া কলের চিন্তাধারা ভিন্নমুখী। আজ যারাই হাওয়া-কল নিয়ে চিন্তা করছেন তারা ভাবছেন কিভাবে হাওয়াকলকে বিদ্যুৎ উৎপাদন-কারী যন্ত্র জেনারেটর-এর সঙ্গে সংযুক্ত করে আরও বেশী বেশী করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাওয়া কল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী এগিয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাসা (National Aeronautics & Space Administration, NASA) নামক সংগঠনটি এমন একটি হাওয়া-কল প্রস্তুত করেছে যার সাহায্যে ১০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। ওদেশেরই অন্য একটি প্রস্তুতকারক সংস্থা এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যার সাহায্যে ঘণ্টায় ২৩ মাইল বেগে হাওয়া বইলে ২০০ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকান এনার্জি অল্টারনেটিভস্ (American Energy Alternatives) নামক একটি সংস্থা এমন একটি হাওয়া-কল তৈরী করেছে যার সাহায্যে ১·৫ কিলোওয়াট থেকে ৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পাওয়ার ডেভেলপারস্ (Independent Power Developers) নামক আর একটি মার্কিন সংস্থা একটি বিশেষ ধরণের হাওয়া-কল তৈরী করতে পেরেছে ; এই হাওয়া কলটির তিনটি পাখা (blade) ; আর এই হাওয়া কলের সাহায্যে ১৫ থেকে ১৮ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। নতুন এই হাওয়া কলটির সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট হল যে, উৎপাদিত বিদ্যুৎ ২৪ থেকে ২৪০ ভোল্ট ডি সি। অন্যান্য দেশগুলিও বাতাসের শক্তি কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে পিছিয়ে নেই। ফ্রান্সের একটি সংস্থা অ্যারোওয়াট (Aerowatt) নামক একটি হাওয়া চালিত বৈদ্যুতিক জেনারেটর
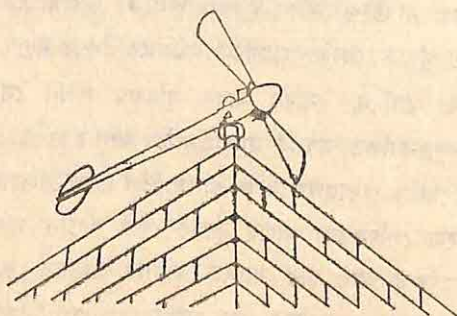
অ্যারোওয়াট

তৈরী করেছে। এই হাওয়া কলটি বিভিন্ন আকারে তৈরী করা হচ্ছে; যার ফলে হাওয়ার গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৭.১৫ মিটার (অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৬ মাইল) হলেই এই যন্ত্রের সাহায্যে (আকার অনুযায়ী ২৮ থেকে ৪১ কিলোওয়াট) বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

সুইজারল্যাণ্ডের ইলেকট্রো গ্যাম্ব উইণ্টারহার (Electro Gumbh Winterthur) নামক একটি সংস্থায় এক ধরণের হাওয়া চালিত বৈদ্যুতিক জেনারেটর তৈরী করছে। যন্ত্রটির নাম রাখা হয়েছে "ইলেক্‌ট্রো জেনারেটর"। এই
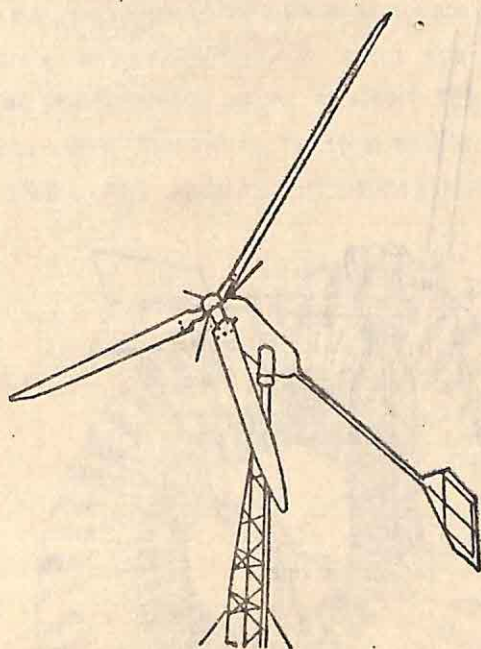
ইলেকট্রো জেনারেটর

যন্ত্রটিও বিভিন্ন আকারে তৈরী করা হচ্ছে। তুলনামূলকভাবে এর কর্মক্ষমতা কম। তিনটি পাখা সমন্বিত এই যন্ত্রটি সেকেণ্ড ১০ মিটার হাওয়ার গতিবেগ (অর্থাৎ ঘণ্টায় ২৩ মাইল) থাকলে ৫০০০ ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। (সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতার হিসাবটিই উল্লিখিত হল।)

পশ্চিম জার্মানীর মাশিনেনফ্যাব্রিক লুডউইগ বোনিং (Maschinenfabrik

Ludwig Bening) নামক একটি সংস্থায় লুবিং (Lubing) নামে একটি হাওয়া চালিত বৈদ্যুতিক জেনারেটর তৈরী হচ্ছে। এই যন্ত্রটির পাখা তিনটি, ফাইবার গ্লাস নির্মিত। সাধারণতঃ এই হাওয়া-কলটি ১২ মিটার উচু একটি স্তম্ভর উপর বসান হয়।

অস্ট্রেলিয়ার ডানলাইট ইলেক্ট্রিকাল কোম্পানী (Dunlite Electrical Co) "ডানলাইট" নামে একটি তিন পাখা বিশিষ্ট হাওয়া চালিত বৈদ্যুতিক জেনারেটর তৈরী করেছে। এর সাহায্যে ১ থেকে ২ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন
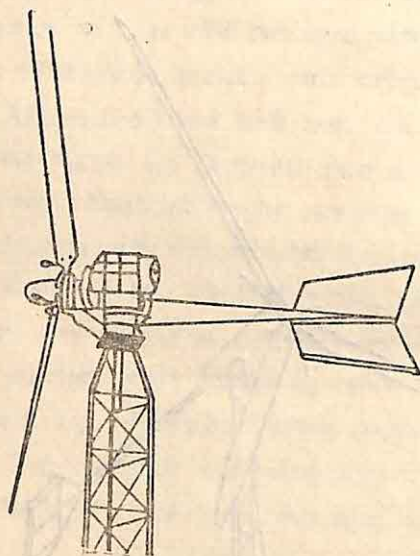
ডানলাইট

সম্ভব। আর্জেণ্টিনা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ প্রচেষ্টায় অ্যারোমোটর নামের একটি হাওয়া কল সম্প্রতি তৈরী হচ্ছে। অ্যারোমোটরের বৈশিষ্ট্য হল—এই যন্ত্রর সাহায্যে কেবলমাত্র জল উত্তোলনের কাজটিই সম্পন্ন করা যায়। ২১ ফুট —৪৭ ফুট উচ্চতার একটি স্তম্ভর (tower) উপর বহু পাখা বিশিষ্ট এই হাওয়া কলটি বসিয়ে দিলে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাম্প জল তোলার কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে সব হাওয়া কলের খোঁজ খবর পাওয়া গেল তা ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হাওয়ার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচেষ্টা অল্পবিস্তর হচ্ছে। ভারতবর্ষে দু-তিন রকম হাওয়া কল তৈরী হয়েছে। তবে এগুলি মূলতঃ কৃষিকার্যে জল সরবরাহর জন্য ব্যবহারযোগ্য।

উল্লিখিত হাওয়া কলগুলি আকার ও কার্যক্ষমতার দিক থেকে ভিন্ন হলেও তাদের গঠন প্রণালী কিন্তু প্রায় এক। এই হাওয়া কলগুলির সবকটিরই পাখা আছে। পাখার সংখ্যা কম-বেশী হলেও প্রায় প্রতিটি যন্ত্রর পাখাই ধাতুনির্মিত। প্রতিটি যন্ত্রই একটি উঁচু জায়গায় বা উঁচু স্তম্ভর উপর বসাতে হয়। আর হাওয়ার বেগ বেশী না হলে যে এগুলি সম্পূর্ণ ব্যর্থ একথা না বললেও চলে। এই ধরনের যন্ত্র-গুলির দামও খুব একটা কম না হওয়ায় এগুলি জনপ্রিয় হচ্ছে না। তুলনামূলক-ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর ওকলাহামা প্রদেশের আমেরিকান উইণ্ড টারবাইন কোম্পানী (American Wind Turbine Co.) যে হাওয়া কলটি তৈরী করেছে তা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। এদের যন্ত্রটির নাম "বাই সাইকেল হুইল টারবাইন" এই হাওয়া
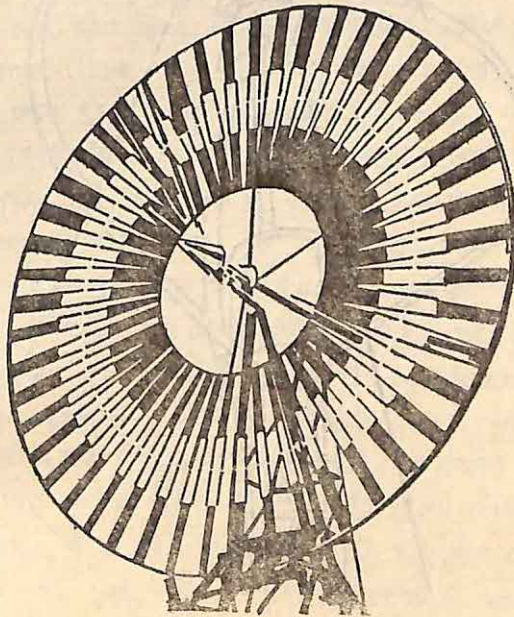
বাইসাইকেল হুইল টারবাইন

কলের গঠন প্রণালী বাই সাইকেলের চাকার মত। সাইকেলের চাকার স্পোকের (চাকার পরিধি এবং কেন্দ্র যে তারের দ্বারা সংযুক্ত থাকে) বদলে এখানে পাতলা অ্যালুমিনিয়াম পাত ব্যহহৃত হয়। এই যন্ত্রটি এ. সি. এবং ডি. সি. দু'ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদনেই সক্ষম। বিদ্যুৎ কম্পাঙ্কও নির্দ্দিষ্ট থাকে। যন্ত্রটির দামও কম। এই হাওয়া-কলটি জনপ্রিয় হচ্ছে। হাওয়া কলের জগতে নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেছে "দারিয়াস ভার্টিকাল অ্যাক্সিস রোটর" (Darrius Vertical Axis Rotor)। এই হাওয়া-কলটি কিন্তু কোন সাম্প্রতিক আবিষ্কার নয়। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে জি, জে, এম, দারিয়াস ফ্রান্সে যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেন এবং পেটেণ্ট নেন। তারপর থেকে যন্ত্রটি নিয়ে তেমন কোন চিন্তা ভাবনা হয়নি। সম্প্রতি কানাডার ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল (National Research Council) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দু'একটি গবেষণাগারে দারিয়াস ভার্টিকাল অ্যাক্সিস রোটর নিয়ে নতুন নতুন গবেষণা হচ্ছে।
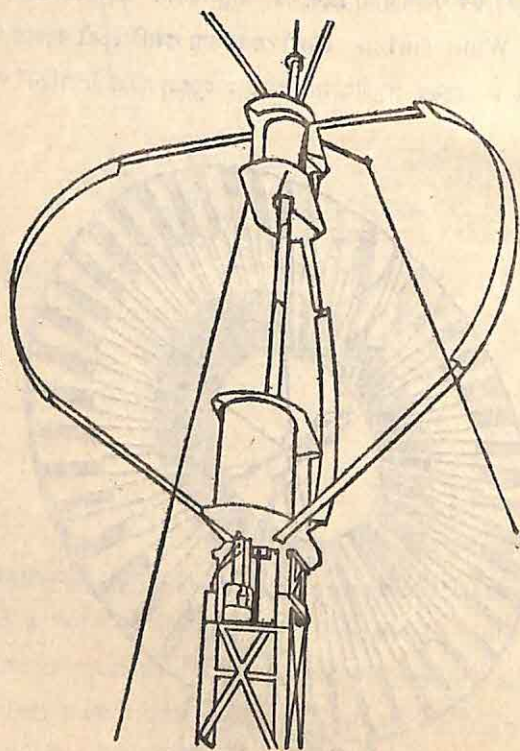
দারিয়াস ভাটিকাল অ্যাক্সিস রোটর

তাদের ফলাফল উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। ছবি থেকে যন্ত্রটির গঠন বৈশিষ্ট পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। হাওয়া যেদিক থেকেই আসুক না কেন যন্ত্রটি ঘুরতে সক্ষম। যন্ত্রটির ফয়েলগুলি একই দিকে ঘোরে এবং কেন্দ্রে অবস্থিত উলম্ব অক্ষদণ্ডটি (Vertical Axis Shaft) ঘুরতে শুরু করে। এই অক্ষদণ্ডটি জেনারেটরের রোটরের সাথে সংযুক্ত। ফলে হাওয়া দিলেই জেনারেটর ঘুরতে পারে। অন্যান্য সমস্ত হাওয়া কলের পাখাগুলির অক্ষদণ্ড অনুভূমিক (horizontal) হয়। ফলে অনুভূমিক অক্ষদণ্ডর ঘূর্ণনে সৃষ্ট যান্ত্রিক শক্তি যান্ত্রিক উপায়ে জেনারেটরের অক্ষদণ্ডে পাঠানোর সময় কিছু যান্ত্রিক শক্তি ক্ষয় হয়। ফলে জেনারেটরের কার্যক্ষমতা কমে যায়। সেদিক থেকে দারিয়াস হাওয়া কলে সুবিধা বেশী। এই যন্ত্রর সাহায্যে এখনও পর্যন্ত ১০ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা গেছে। তাছাড়া দামও কম। সুতরাং দারিয়াস ভার্টিকাল অ্যাক্সিস রোটর অচিরেই আরও জনপ্রিয় হবে।

সমুদ্রের জল ঃ অফুরন্ত শক্তির উৎস ঃ

কথায় বলে পৃথিবীর তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল। সত্যি সত্যিই পৃথিবীতে স্থলভাগের চেয়ে জলভাগের আয়তন অনেক বেশী। এই সুবিশাল জলরাশির অনেকটাই আবার সমুদ্র। সমুদ্রের জলকে মানুষের প্রয়োজনে অনেকদিন ধরেই কাজে লাগানো হচ্ছে। লবণ সংগ্রহর মূল উৎস হিসেবে সমুদ্র তো সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু শুধুমাত্র লবণ সংগ্রহ অথবা মাছ চাষ কিংবা পরিবহন মাধ্যম হিসাবে সমুদ্রর ব্যবহারে বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট নন। শক্তি সন্ধানে মানুষ যখন হন্যে হয়ে ঘুরছে তখন বিজ্ঞানীরা সমুদ্রকে শক্তি উৎস হিসাবে ব্যবহারের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। নিরবিচ্ছিন্ন গবেষণা সাফল্যও এনেছে।

সাগর জলের জোয়ার ভাঁটার শক্তির (Tidal Energy) সুযোগ অনেককাল ধরেই নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আর জোয়ার-ভাঁটা নদীর জলেও আছে। সুতরাং নদীও বাদ পড়েনি। জোয়ার-ভাঁটাকে কাজে লাগিয়ে জল উত্তোলনের কাজ বা সেচের কাজে জল সরবরাহর কাজ অনেকদিন ধরেই হচ্ছে। গত শতাব্দীতে লণ্ডন শহরে জোয়ার-ভাঁটার শক্তির সাহায্যে একটা ইঞ্জিনও চালান হয়েছিল। সমুদ্র বা নদীর জলের জোয়ার-ভাঁটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন যন্ত্র অনেকদিন আগে উদ্ভাবিত হয়েছে। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের এক হিসেবে জানা যায় যে শুধুমাত্র ফ্রান্সেই তখনও পর্যন্ত জোয়ার-ভাঁটার শক্তির ব্যবহারোপযোগী ২০০টি যন্ত্রর পেটেণ্ট নেওয়া হয়েছে। তবে জোয়ার-ভাঁটার শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরের

কাজটি একেবারেই সাম্প্রতিক ; বিংশ শতাব্দীতেই এর সূচনা। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাসামাকুয়োডি উপসাগরে (Passamaquoddy Bay) ৭ লক্ষ ডলার ব্যয় করে একটা বিদ্যুৎ প্রকল্প সংস্থাপন করা হয়। ২০০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এই বিদ্যুৎ প্রকল্প কিন্তু আদৌ চালু করা যায়নি। কারণ উৎপাদন ব্যয় ছিল খুব বেশী। সোভিয়েত ইউনিয়নেও ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এই ধরণের একটি বিদ্যুৎ প্রকল্প সংস্থাপনের চেষ্টা হয়। কিন্তু উৎপাদন ব্যয় আধিক্যর সম্ভাবনায় তা বাতিল হয়।

জোয়ার-ভাঁটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি সাফল্য জনক-ভাবে কাজ করছে, সে দুটিই ফ্রান্সে অবস্থিত। একটি ৯ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন সেণ্ট মার্লো বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং অপরটি ২৪০ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন র‍্যান্স বিদ্যুৎ প্রকল্প। এখন কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জোয়ার-ভাঁটার শক্তি কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা হচ্ছে।

জোয়ার-ভাঁটার শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি সরল। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি টারবাইন এই প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ আহরণের মূল সম্বল। তবে এই কাজে ব্যবহৃত টারবাইনের একটু বৈশিষ্ট থাকা দরকার। প্রথমতঃ এই টারবাইন যেন খুব নিম্ন উচ্চতার জল প্রবাহর আঘাতে ঘুর্ণনক্ষম হয়। দ্বিতীয়তঃ জল প্রবাহর দিক পরিবর্তনের সাথে সাথে টারবাইনটিও যেন ঘুর্ণন অভিমুখ পরিবর্তন করে কার্যক্ষম থাকতে পারে। বৈদ্যুতিক জেনারেটরটি টারবাইনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। জেনারেটর এবং টারবাইনের কিছু যন্ত্রাংশ একসাথে একটি জল-নিরোধক বাক্সের ভিতর রেখে তাকে জলেই ডুবিয়ে রাখা হয়। এ ধরণের বিদ্যুৎ প্রকল্পর নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য একই সাথে অনেকগুলি ছোট ছোট টারবাইন ও জেনারেটর বসান দরকার। সমুদ্র বা নদী অর্থাৎ যে জলে জোয়ার-ভাঁটা হয় সেখানে এভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব।

সূর্যরশ্মি সমুদ্র জলে পড়ে। স্থলভাগে যতটুকু সূর্যরশ্মি পড়ে তার চেয়ে অনেক বেশী রশ্মি সমুদ্র জলে পড়ে। কারণ, (১) জলভাগ বেশী ; (২) স্থলভাগে বাড়ী-ঘর প্রভৃতি থাকায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বিস্তীর্ণ স্থলভাগ উত্তপ্ত হবার সুযোগ পায় না। ফলে সমুদ্রর জল গরম হয়। সূর্য কিরণে সমুদ্র জলের উপরিভাগ গরম হয় কিন্তু ভিতরের জল ঠাণ্ডা থাকে। অর্থাৎ সূর্যরশ্মি সমুদ্র জলের তাপমাত্রায় তারতম্য ঘটায়।

সমুদ্র জলের তাপের তারতম্যকে বিজ্ঞানীরা ছেড়ে দিতে রাজী নন। অতএব সমুদ্র জলের তাপের তারতম্য থেকে বিদ্যুৎ আহরণের ব্যবস্থা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ আহরণের নাম ওশ্যান থার্মাল এনার্জি কনভার্শন (Ocean Thermal Energy Conversion) সংক্ষেপে ওটেক (O. T. E. C.)। সমুদ্র জলে সূর্যরশ্মি পড়লে সমুদ্র জলের উপরিভাগ ২১ থেকে ২৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত গরম হয়। অথচ সমুদ্রের ভিতরে জলের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থাকে। তবে এ ধরনের তাপ বৈষম্য উষ্ণ অঞ্চলের সমুদ্রেই হয়। গত শতাব্দীতে (১৮৮১) ফ্রান্সে পদার্থ বিজ্ঞানী ডি. আর্সোনভাল (D. Arsonval) এ প্রসঙ্গে চিন্তা করেন। পরবর্তীতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন বৈজ্ঞানিক জর্জ ক্লাউড (George Cloud) কিউবার সমুদ্রতটে এই ধারণাকে বাস্তবায়িত করেন। বর্তমানে ওটেক নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে। এবং বিভিন্ন দেশে ওটেক পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। তাপ পরিবর্তক বা হিট এক্সচেঞ্জার-এর সাহায্যে সূর্যরশ্মির পতনে উদ্ভূত সমুদ্র জলের তাপের তারতম্য ঘটিয়ে বাষ্প সৃষ্টি করে তার সাহায্যে টারবাইন ঘুরানো হল ওটেক পদ্ধতির মূল নীতি। আর টারবাইন ঘুরলে তার সাহায্যে জেনারেটর ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব—একথা নতুন করে বলার দরকার নেই। ওটেক পদ্ধতির সম্ভাবনা ও সমস্যা দুই-ই প্রচুর। সুতরাং এখনও এই পদ্ধতি জনপ্রিয় করার চেষ্টা হয়নি।

প্রচলিত (পূর্বোল্লিখিত) পদ্ধতিগুলি ছাড়াও জল প্রবাহর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আরও কয়েকটি পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। যেমন হাইড্রলিক র‍্যাম (Hydraulic Ram), হাইড্রলিক এয়ার কম্প্রেসার (Hydraulic Air Compressor) প্রভৃতি যন্ত্র সহায়তায় জলশক্তিকে বিদ্যুৎ-এ রূপান্তরিত করা সম্ভব। কিন্তু উৎপাদন ব্যয় আধিক্য এবং অতি অল্প কার্যক্ষমতার জন্য এসব পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন হয়নি।

জৈব পদার্থ ঃ শক্তির নতুন উৎস (Biomass new energy source) ঃ

মানুষের জীবন ধারণের জন্য শক্তি সবসময়ই প্রয়োজন ; এই শক্তি দুভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ মানুষের শারীরিক ক্ষমতা বজায় রাখার প্রয়োজনে ; দ্বিতীয়তঃ জীবন যাত্রা সহজ-সুন্দর সাবলীল রাখার উদ্দেশ্যে। দুই ধরনের শক্তি মানুষ দুভাবে সংগ্রহ করে। প্রথম ধরনের শক্তি খাদ্যের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। দ্বিতীয় ধরণের প্রয়োজনে শক্তি সংগ্রহর বিভিন্ন উৎস নিয়েই এত আলোচনা হচ্ছে।

খাদ্য হিসাবে জৈব পদার্থর ব্যবহার মানুষ তার আবির্ভাবের সময় থেকেই করে আসছে এবং আজও তা মানব জীবনে সমানভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু বর্তমানের বৈজ্ঞানিক মহল জৈব পদার্থকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহারের কথা চিন্তা করেছেন। খুব খুঁটিয়ে দেখলে একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে বর্তমানে প্রচলিত শক্তি উৎসগুলিও মূলত জৈব পদার্থ ভিত্তিক। যেমন—কয়লা বা পেট্রোলিয়াম জৈব পদার্থ উদ্ভিদের একটা বিশেষ অবস্থার রূপান্তর মাত্র।

এ ধরণের প্রচলিত ধারণার কথা বাদ দিয়েও জৈব পদার্থকে সরাসরি শক্তি সংগ্রহর উপাদান হিসাবে ব্যবহারের যে সব প্রচেষ্টা চলছে তার একটু খোঁজ নেওয়া যাক।

নির্দিষ্ট ওজনের শুকনো গাছপালা থেকে সমান ওজনের কয়লার দুই-তৃতীয়াংশ শক্তি পাওয়া যায়। জৈব পদার্থকে সরাসরি শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের জ্বালানীরূপে ব্যবহার করে ভালই ফল পাওয়া গেছে। জৈব পদার্থকে বায়ুশূন্য স্থানে জীবাণু সহযোগে কম উত্তাপে গরম করলে তা থেকে মিথেন এবং কার্বন-ডায়-অক্সাইড পাওয়া যায়। মিথেন বাষ্পীয় জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জৈব আবর্জনাকে ৩৮০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কার্বন-মনক্সাইড সহযোগে গরম করলে এর অর্ধেক অংশ জ্বালানী তেলে পরিণত হয়। এই ধরণের জ্বালানী তেলে শতকরা ০·৩৩ ভাগ গন্ধক থাকায় পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা থাকে না। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ৪২৪ গ্রাম শুকনো পাতা থেকে ৭ ঘনফুট মিথেন তৈরী করেছেন। এক হেক্টর (১০০ মিটার × ১০০ মিটার অর্থাৎ ১০০০০ বর্গ মিটার) জমিতে বছরে যে পরিমাণ মিষ্টি শরগম (Sweet Sorghum) উপৎন্ন হয় তা থেকে ৯৩০·০৬ মেগাওয়াট-ঘণ্টা শক্তি পাওয়া সম্ভব। এক হেক্টর জমিতে উৎপাদিত এক্সটিক প্রাগ শরগম (Exotic Prage Sorghum) থেকে ৩৪৭·২৩ মেগাওয়াট-ঘণ্টা শক্তি আহরণ করা যায়। একই পরিমাণ জমির জলজ হায়াসিন্থর (Water Hyacinth) সারা বছরের উৎপাদন থেকে ৭৪৪·৪৪ মেগাওয়াট-ঘণ্টা শক্তি পাওয়া যায়। এক হেক্টর জমিতে সারা বছরে ১১২ টন আখ উৎপন্ন হয়। ঐ আখ থেকে ৫৫৫·৫৬ মেগাওয়াট-ঘণ্টা শক্তি পাওয়া যায়। ২০ টন উচ্চ ফলনশীল পপলার (Hybrid Poplar) থেকে ৯৫ মেগাওয়াট-ঘণ্টা শক্তি পাওয়া যায়। ৮·৩ টন কোপিস (Coppice) থেকে ৪০ মেগাওয়াট-ঘণ্টা শক্তি পাওয়া যেতে পারে। ৩৯·১ টন ইউক্যালিপটাস

গাছ থেকে ১৮৮.৮৯ মেগাওয়াট ঘণ্টা শক্তি সংগ্রহ করা যায়। ২০০ টন অ্যালজী (Algae) থেকে ৪০৫.৫৬ মেগাওয়াট-ঘণ্টা শক্তি পাওয়া যায়। ২০০ টন ক্যাসুয়ারিনা থেকে ১৩৭৫ মেগাওয়াট-ঘণ্টা শক্তি সংগ্রহ করা যায়। উপরের সব হিসাব কিন্তু জৈব পদার্থ থেকে সংগৃহীত জ্বালানীর উপাদানের মাধ্যমে শক্তি সংগ্রহর হিসাব। সুতরাং আগামী দিনে জৈব পদার্থ যে শক্তি উৎস হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে এমন আশা নিশ্চয়ই করা যায়।

প্রচলিত শক্তি উৎসগুলির ভাঁড়ার যতই সংকুচিত হচ্ছে ততই নতুন নতুন শক্তির উৎস সন্ধানে মানুষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শক্তির জগতে সংযুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন উৎস। প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমাগত গবেষণা—সমীক্ষায় ব্যস্ত মানুষ, এমনভাবেই একদিন আবিষ্কার করবে কোন এক অফুরন্ত শক্তির উৎস।

তথ্য সূত্র

১। Introduction to India's Economic Minerals—N. L. Sharma & K. S. V. Ram, (1972)

২। India's Mineral Wealth—I. Brown & A. K. Dey (1955).

৩। Indian Minerals Year Book ; 1970.

৪। The Energy Resources of the Earth—M. Hubert. King [Scientific American, September 1971, Vol-224 No. 3]

৫। Direct Energy Conversion—W. A. Stanley (1971).

৬। Introduction to Energy Technology—V. A. Venicov & E. V. Putyatin

৭। বিজ্ঞানের ইতিহাস—সমরেন্দ্র নাথ সেন।

৮। All About Atomic Energy—Laura Ferni.

৯। Energy for Man—H. Thirreug.

১০। Dictionary of Scientist—A. V. Hawart.

১১। Energy for Rural Development—National Academy of Sciences (U. S. A.)

১২। Energy Strategies for India—A. K. Saha [Presidential address for the sixty-seventh session of the Indian Science Congress 1980]

১৩। Energy : Second Series—K. P. Parrikh.

১৪। Energy : Resources, Demand, Conversion—Chaman Kashkari.

১৫। Report of the Working Group on Energy Policy—Government of India (1979).

এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকা।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য অন্যান্য বিজ্ঞান পুস্তিকা

১। রোগ ও তার প্রতিষেধ/সুখময় ভট্টাচার্য/৫·০০
২। পেশাগত ব্যাধি/শ্রীকুমার রায়/৭·০০
৩। আমাদের দৃষ্টিতে গণিত/প্রদীপকুমার মজুমদার/৭·০০
৪। বয়সন্ধি/বাসুদেব দত্তচৌধুরী/৯.০০
৫। মানুষের মন/অরুণ কুমার রায়চৌধুরী
৬। পশুপাখীর আচার ব্যবহার/জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়
৭। ভূতাত্ত্বিকের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি/সঙ্কর্ষণ রায়
৮। হাঁপানি রোগ/মনীষ প্রধান
৯। ১০৩টী মৌলিক পদার্থ/কানাইলাল মুখোপাধ্যায়
১০। ময়লা জল পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার/ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ
১১। গ্রাম পুনর্গঠনে প্রযুক্তি/দুর্গা বসু

সাত টাকা